সৌন্দর্যদর্শন

প্রবাসজীবন চৌধুরী



বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। সংখ্যা ১০৮

প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৬১

পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৮৭ : ১৯০২ শক

কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে স্বল্পমূল্যে প্রাপ্ত কাগজে মুদ্রিত

বিশ্বভারতী

মূল্য ২.০০ টাকা

প্রকাশক রণজিৎ রায়

বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

মুদ্রক জয়ন্ত বাকচি

পি. এম. বাকচি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড

১৯ গুলু ওস্তাগর লেন। কলিকাতা ৬

সূচীপত্র

॥ মলাটের চিত্র ॥

প্রজ্ঞাপারমিতা। জাভা-ভাস্কর্য। লাইডেন মিউজিয়ম, হল্যাণ্ড। ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দ
চিত্রখানি শ্রীবিমলকুমার দত্তের উদ্‌যোগে প্রাপ্ত

শিল্পাচার্য

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্মরণে

সৌন্দর্যদর্শনের বিষয়বস্তু

সৌন্দর্যের প্রকাশ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু দার্শনিক বিচার করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের এই-সকল বিচার ও গবেষণা লইয়া একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই শাস্ত্রকে দর্শনেরই একটি শাখা বলা যায়। সৌন্দর্য সম্বন্ধে দার্শনিকদের বহু বিচার-বিতর্ক এইখানে পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহাদের সমালোচনার সমষ্টিকে সৌন্দর্যদর্শন নামে অভিহিত করা যায়।

সৌন্দর্য বিচার করা এবং সৌন্দর্য উপলব্ধি করা বা সৃষ্টি করায় পার্থক্য আছে। সুতরাং ইহা মনে করা ভুল হইবে যে, সৌন্দর্যদর্শন পড়িয়া বা আলোচনা করিয়া রূপদক্ষ কি রূপকার হওয়া যায়। নীতিশাস্ত্র পড়িলে যেমন নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না সেইরূপ ন্যায়শাস্ত্র আলোচনা করিলে তার্কিক হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু নির্ভুল নৈয়ায়িক হওয়া যাইবে এমন কথা নাই। এই কথাগুলি সৌন্দর্যদর্শন আলোচনার সময় মনে রাখিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া সৌন্দর্য-দর্শন আলোচনার কোনো বিশেষ সার্থকতা নাই এরূপ মনে করা ভুল হইবে। সৌন্দর্য আমরা সকলেই অল্পবিস্তর উপলব্ধি করি ও তদ্‌দরুন বিশেষ আনন্দটি উপভোগ করি। এই উপলব্ধির সহিতই আমাদের বিচারবুদ্ধি ও চিন্তাধারা জাগিয়া ওঠে এবং আমাদের জানিতে ইচ্ছা হয় যে, এই আনন্দের উৎস কোথায় এবং ইহার স্বরূপ কি। এই প্রশ্নটি তখন উত্তর খোঁজে এবং যতক্ষণ না যুক্তিসংগত উত্তর খুঁজিয়া পায় ততক্ষণ আমাদের হৃদয় এবং বুদ্ধি তৃপ্ত হয় না এবং সৌন্দর্যের উপলব্ধিও অপূর্ণ রহিয়া যায়। কারণ হৃদয় ও বুদ্ধি নিঃসম্পর্ক নহে, বরং তাহাদের একের সহিত অপরের যোগ আছে; এইজন্য দুইয়েরই সংযোগ ভিন্ন পরিপূর্ণ আনন্দ পাওয়া যায় না। ব্যক্তির সমগ্রতা দুইয়েরই মিলনে এবং দুইয়েরই তৃপ্তিসাধন ভিন্ন তাহার চরম পরিতৃপ্তি আসে না। সেইভাবে রসানুভূতিকে সৌন্দর্যদর্শন ঠিক

প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য না করিলেও রূপ-বিশ্লেষণকারীর আনন্দোপলব্ধির প্রসারে সহায়তা করে এবং পরোক্ষভাবে রসানুভূতিকেও জাগ্রত করে।

সৌন্দর্যদর্শন ফলিত-বিজ্ঞান নহে; ইহা রূপবিচারের বা রূপসৃষ্টির কোনো বাঁধা-ধরা নিয়মাবলী প্রকাশ করে না। কিন্তু এই কারণে রূপ সম্বন্ধে এই-সব বিচার-বিশ্লেষণ সার্থকতাহীন বৃথা তর্কজাল মাত্র নহে বরং সৌন্দর্যদর্শনের সহায়তায় বিশ্লেষণকারীর রসানুভূতি বিচার-বিতর্ক দ্বারা শোধিত ও উন্নত হইয়া তাহার সম্মুখে রূপজগতের আবরণ খুলিয়া দেয়।

সৌন্দর্য : প্রকৃতির ও শিল্পের

প্রথমেই মনে হয় যে, যে ক্ষেত্রে বিশ্বপ্রকৃতির লীলায় সৌন্দর্যের অজস্র প্রকাশ আমরা নিত্যই দেখিতে পাই সে ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব শিল্পসৃষ্টির কোনো সার্থকতা আছে কি? ঋতুতে ঋতুতে এত ফুলের মেলা, প্রতিদিন প্রভাতে সন্ধ্যায় আকাশে কত রঙের খেলা, কোনো শিল্পীর তুলি কি এগুলি ধরিতে পারে? তবে কেন আমরা ছবি, গান, কবিতা রচনা করিয়া, নাচিয়া গাহিয়া, পাথর কুঁদিয়া, এক-কথায় শিল্প-রচনা[১] করিয়া, সৌন্দর্যকে ধরিতে চাই? ইহা কি ব্যর্থ সাধনা? এই কথার সব চেয়ে বড়ো উত্তর এই যে, শিল্পের সৌন্দর্য যাহা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট তাহা প্রকৃতির সৌন্দর্যের চেয়ে উন্নত এবং অধিক বৈভবশালী। ইংরেজ কবি কীট্‌স্ এই কথা ভাবিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলেন যে, মানবের রূপসৃষ্টি ঈশ্বরের সৃষ্টি হইতে কি করিয়া অধিক মহিমা লাভ করিতে পারে? কিন্তু ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে বেশি দূর যাইতে হইবে না। প্রথমত, আমরা দেখি কোনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্মুখে বেশিক্ষণ আমরা রসগ্রাহী মন লইয়া দাঁড়াইতে পারি

১ এখানে 'শিল্প' শব্দের অর্থ ব্যাপক ভাবে ধরিতে হইবে। কাব্য চিত্রকলা স্থাপত্য ভাস্কর্য ও নৃত্যগীত— এই-সকলকেই শিল্প (আর্ট) বলা চলে।

না। প্রকৃতি আমাদের চোখে এতই বাস্তব যে তাহাকে আমরা প্রয়োজন হইতে ভিন্ন করিয়া রাখিতে পারি না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত প্রকৃতির যোগ এত নিবিড় যে তাহাকে রূপদক্ষের দৃষ্টি দিয়া দেখা অনেক সময়ই সাধনাসাপেক্ষ। সন্ধ্যার আকাশ দেখিয়া মনে করি, রাত্রি নামিল—বাড়ি ফিরিতে হইবে। সুন্দর ফুল দেখিলে তুলিয়া লইতে যাই পূজার জন্য কি প্রিয়জনকে উপহার দিতে। সুতরাং প্রকৃতির সামনে আমাদের কার্যকরী বুদ্ধিকে বেশিক্ষণ আটক রাখা যায় না। সৌন্দর্যোপলব্ধি বা রসাস্বাদন করিতে হইলে মনকে সাধারণ কামনাবাসনার ঊর্ধ্বে লইয়া যাইতে হয়। শিল্পে যখন কোনো সৌন্দর্য দেখি তখন জানি যে বস্তুটি ব্যবহারিক প্রয়োজনের অযোগ্য, এক হিসাবে হয়তো অবাস্তব ; সুতরাং আমাদের কার্যকরী বুদ্ধি সেখানে নিরস্ত হইয়া থাকে এবং রসপিপাসু মনই জাগিয়া থাকে, সুতরাং শিল্পের সৌন্দর্য বেশি করিয়া পাই। দ্বিতীয়ত, আমরা দেখি প্রকৃতির সব বস্তুই একটি কঠিন নিয়মে চলে ; কার্যকারণ-সূত্রে তাহারা গাঁথা। কিন্তু সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য তাহার নিজস্বপ্রকাশে ; তাহাতে যেন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই, সৌন্দর্য যেন একটি বিশুদ্ধ লীলা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে কোনো সময় কিছুক্ষণের জন্য এই লীলার ভাব আমরা পাই, কিন্তু মানুষের শিল্পসৃষ্টি যেখানে সার্থক সেখানে এই ভাবই সমগ্রভাবে বিরাজ হইতে দেখি, কারণ শিল্পী তাঁহার সৃষ্টির মধ্য দিয়া তাঁহার পরিপূর্ণ সৌন্দর্যোপলব্ধি এবং অবাধ কল্পনার পরিচয় দিয়া থাকেন। এইভাবে বিশ্বপ্রকৃতিকেও কোনো-এক মহাশিল্পী বা সৃষ্টিকর্তার রচনা বলিয়া মানুষ যখন ভাবিতে পারে তখনই সে প্রকৃতিতে এই মহান্ সৌন্দর্যের লীলা ওতপ্রোত দেখিতে পায়। কিন্তু বিশ্ব-প্রকৃতিকে এমন ভাবে কেবল কয়েকজন মরমী কবি ও সাধকই দেখিতে পারিয়াছেন। সাধারণের কাছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপেক্ষা শিল্পের সৌন্দর্য আদরণীয় এবং সৌন্দর্যদর্শনেও শিল্পকথাই বিশেষ করিয়া আলোচিত হইয়া আসিতেছে।

সৌন্দর্যের আধার ও বিষয়বস্তু

প্রত্যেক শব্দের অর্থ আছে, সেইটির দ্বারা কোনো একটি বস্তুকে বোঝায়। বস্তুটি বিষয় এবং শব্দটি হইল তাহার আধার। বিজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্ব আলোচনায় যে-সকল শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহাদের অর্থেই আমাদের আবশ্যক, তাহাদের শুনিতে কেমন লাগে বা লিখিলে কেমন দেখায়— ইহা ভাবিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কবিতায় গানে শব্দের দুই দিকই— তাহার অর্থসম্পদ ও শ্রুতিমাধুর্য অর্থাৎ তাহার বিষয় ও আধার উভয়ই— প্রয়োজনীয়; এক কথায় শিল্পে কী রচনা করিলাম এবং কেমন করিয়া রচনা করিলাম দুইই জানিতে হইবে। রচনার বিষয়বস্তু ও প্রণালী উভয়েরই এখানে সমান গুরুত্ব, কোনোটিকেই ছোট্টো করা চলে না। কোনো শিল্পে বিষয় একটু প্রধান হয়, যেমন নাটকে ও গল্পে বা প্রতিকৃতি-চিত্রে। আবার কোনো শিল্পে আধারই মুখ্য, যেমন আলপনা-রচনা বা সুরসৃষ্টি। কিন্তু পরিমাণে কম-বেশি হইলেও গুরুত্বে এবং প্রয়োজনীয়তায় দুইই সমান।

প্রকৃত শিল্পে আধার ও বিষয়বস্তু এমনভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকে যে তাহাদের পৃথক অস্তিত্ব বোঝা যায় না। একটি সুন্দর ভাবঘন কবিতা অন্য ভাষায় অনূদিত হইলে, এমন-কি, সেই ভাষাতেই অর্থ করিতে গেলে, কবিতাটিকে হারাই; কারণ, অর্থ বা বিষয়বস্তু একই থাকিলেও শব্দ ছন্দ মিল ইত্যাদি যাহা আধার তাহা ভিন্ন হয় এবং কবিতার রূপান্তর ঘটে। একটি সার্থক কবিতার অর্থকে গদ্যে বলা যায় না, কারণ কবি তাঁহার কথা কবিতার স্বতন্ত্র ভাষায় বলিয়াছেন। অর্থ বা বিষয়বস্তু অনেকটা তাহার প্রকাশভঙ্গির উপর নির্ভর করে। শব্দচয়ন ছন্দ মিল এগুলি কবিতার বাহ্য-অলংকার মাত্র নহে, বরং এইগুলিই কবিতার অঙ্গ এবং জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতোই ইহাদের সমগ্র রচনাশৈলীর মূলভাবটির সহিত অখণ্ড যোগ থাকে।

শিল্পপ্রণালীকে কেবল কলাকৌশল বা কারিগরির গুণ বলিয়া ছোটো করা ভুল, কারণ এগুলি শিল্পীর বিষয়বস্তু বা ভাব-ভাবনার সহিত অঙ্গাঙ্গিরূপে জড়িত এবং শিল্পসৃষ্টির আনন্দে এই-সকল অংশেরই দান রহিয়াছে; ইহাদের সবাকার সুষ্ঠু ও সুন্দর সমন্বয়েই শিল্প মহিমান্বিত হইয়া ওঠে। বড়ো কবির প্রতিটি কথাই শাশ্বত, তাহার বদলে অন্য কোনো কথা বসাইলে কবিতা নষ্ট হইয়া যায়। সেইরূপ বড়ো চিত্রকরের প্রতিটি রেখা আর রঙের টান অপরিহার্য মনে হয়। এইরূপে আধার যাহাকে (বিষয়বস্তুকে) ধারণ করে মর্যাদায় তাহার সমকক্ষ হইয়া ওঠে।

সৌন্দর্যের বিষয়বস্তুর সত্যাসত্য

গাছের পাখিটি সত্য, আর ছবিতে আঁকা পাখি মিথ্যা— ইহাতে সন্দেহ নাই। কবিতা গল্পের ভাব-ভাবনা বা ঘটনা প্রভৃতি একরকম মিথ্যাই বলিতে হইবে। তবু এক হিসাবে তাহাদের বাস্তবজগতের ভাব-ভাবনা হইতে অধিকতর সত্য বলা যায়, কারণ বাস্তবজগতের যাহা-কিছু তাহাতে মানুষের কল্পনার ছায়া পড়ে না। শিল্পবস্তুর সত্য এই কল্পনার সত্য। গাছের পাখি ঠিক কিরকম দেখিতে এবং তাহাকে দেখিলে কিরকম মনে হয়— তাহা কবি বা চিত্রকর ভাবেন না; সেই পাখি তাঁহার ভাবজগতে যে রূপ নিয়াছে তাহাই তিনি আমাদের ধরিয়া দেন এবং এই রূপসৃষ্টির মধ্যে যে সার্বভৌম ভাবটি আছে উহাই শিল্পী ব্যতীত অপরের প্রাণেও ভাব জাগ্রত করে। মানুষ বিশ্বপ্রকৃতিকে কেমনভাবে দেখে তাহাই গানে কবিতায় ছবিতে বলিয়া যায়, অপর দিকে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বস্তুগুলির যথার্থ স্বরূপ লিখিয়া রাখে। উভয়েই সত্য, কিন্তু দুই রকমের বা দুই স্তরের। এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত সত্য তাহা বলা যায় না, কারণ বুদ্ধির সত্য এবং ভাবের সত্য উভয়কে পাশাপাশি রাখিয়া বুদ্ধি দিয়া বিচার করা চলে না। বুদ্ধি ও ভাবের ঊর্ধ্বে অপর কোনো জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকিলে হয়তো এই বিচার সম্ভব হইত।

কবি ও দার্শনিকগণের মধ্যে কয়েকজন শিল্পের সত্যকেই শুধু স্বীকার করেন, অন্য দিকে কয়েকজন বিজ্ঞান ও দর্শনের সত্যকেই পরম মূল্য দিয়াছেন।

অনুকরণ ও সৃষ্টি

এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, শিল্প কোনো প্রাকৃতিক বস্তুর অনুকরণ বা প্রতিলিপি, না, ইহা স্বাধীনসৃষ্টি? গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতে কবি চিত্রকর মূর্তিকার ও গায়ক ইঁহারা সকলেই অনুকরণকারী, এবং তাঁহাদের জীবন বৃথা সাধনায় অপব্যয়িত করেন। যে বস্তু প্রকৃতিতে আমরা নিত্যই পাই তাহা অনুকরণ করিয়া বা প্রতিলিখিত করিয়া কি লাভ? অস্তাচলে বিদায়সূর্যের বিচিত্র বর্ণসম্ভার প্রতি সন্ধ্যায় প্রকৃতি আমাদের চোখের সম্মুখে ধরিয়া দেয়, তবে কেন শিল্পী তাহাকে তুলিতে ফুটাইয়া তোলেন ও আমরা সেই ছবি দেখি? ইহা কি শুধুই অবসর-বিনোদন? ইহার উত্তরে সব চেয়ে বড়ো কথা এই যে, শিল্পী অনুকরণ করেন না। শিল্পী প্রকৃতিকে দেখেন বটে, কিন্তু প্রকৃতির রূপকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সামনে নূতন একটি ভাবরাজ্য উদ্‌ভাসিত হইয়া ওঠে এবং সেই নূতনত্বের ছাপই আমরা শিল্পীর সৃষ্টিতে পাই। শিল্প যে কেবলমাত্র প্রতিলিপি নহে তাহার সপক্ষে এই কটি কথা বলা যাইতে পারে: প্রথমত, শিল্পী জানেন যে অনুকরণ করায় কোনো সার্থকতা নাই এবং যাহা কেবলমাত্র বাস্তবজগতের ছায়া বা প্রতিলিপি তাহা আমাদের চোখকে অতিশীঘ্রই ক্লান্ত করে। শিল্পী কেন বৃথা সাধনা দ্বারা আমাদের পীড়িত করিবেন? বলা যাইতে পারে যে, শিল্প আমাদের সংকীর্ণ জীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করে এবং যাহা আমরা পাই না বা জানি না তাহাই শিল্পের মধ্য হইতে আহরণ করিয়া উপভোগ করি; যেমন নাটকে উপন্যাসে বহুবিচিত্র দুঃখ-সুখ ভাব-ভাবনা প্রেম ঈর্ষা দুরাশার বর্ণনা পড়িয়া উপভোগ করি, যাহা সাধারণ মানুষে তাহার বৈচিত্র্যহীন জীবনের ছোটো

গণ্ডির মধ্যে পায় না। কিন্তু এই যুক্তি সংগত নহে। বড়ো শিল্প বা প্রকৃত শিল্প কখনো কোনো নূতন বিষয়বস্তু দ্বারা আমাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে না বা আমাদের আবেগগুলিকে প্রশ্রয় দেয় না। ইহা শুধু এক শ্রেণীর মন্দ নাটক উপন্যাস এবং ছবি গানে হইয়া থাকে। যে শিল্প বড়ো এবং সুন্দর, তাহাতে বিষয়বস্তু খুবই সাধারণ এবং সরল হয় এবং ইহাতে ভাবকে প্রশ্রয় না দিয়া ভাবকে মনন করা হয়; এই মনন করার যে আনন্দ তাহাই শিল্পের এবং এই আনন্দ ভাবাবেগের সুখ হইতে ভিন্ন। সাধারণ জীবনে আমরা ভাবের দ্বারা চালিত হই; হাসি কাঁদি, প্রেম করি, হিংসা করি। শিল্পে কিন্তু আমরা ভাবকেই ধরিতে চেষ্টা করি, তাহাকে সামনে ধরিয়া দেখি; তাহাকে ভাষায় সুরেতে রেখা-রঙে বা পাথর কুঁদিয়া প্রকাশ করিতে চাই; এক কথায় তাহাকে মনন করি। এই মনন করিবার সময় আমরা ভাবকে জয় করিয়া লই, ভাবের নিকট হইতে দূরে রহিয়া তাহাকে ভাবি। এইজন্য অভিনয়ে যখন দুঃখ দেখি তখন মনে মনে দুঃখের চেয়ে সুখই অধিক অনুভব করি, ভাবাবেগের সুখ পাই; কারণ দুঃখ তখন বাস্তবজীবনের দুঃখ নয় যে আমাদের চালিত করিবে, ইহা তখন কল্পনাজগতের দুঃখ। দুঃখের ভাবটিকে তখন আমরা মনন করিতেছি এবং মননের আনন্দেই অভিভূত হইতেছি, সুতরাং শিল্পকে বাস্তবজগতের অনুকরণ বলা ভুল, বরং শিল্পই বাস্তবজগতের বস্তুগুলিকে নিজরাজ্যে লইয়া গিয়া রূপান্তরিত করে। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে, অনুকরণ কখনো নিখুঁত হইতে পারে না এবং শিল্পী সেজন্য বৃথা চেষ্টাও করেন না। শিল্পী সর্বদাই কোনো নূতন সৃষ্টি করিতে চান। তৃতীয়ত, যদি কোথাও অনুকরণও নিখুঁত হয় তাহা হইলে চিত্রকরের আদর কমিবে বৈ বাড়িবে না, কারণ অনুকরণ নিখুঁত হইলে শিল্পবস্তুকে বাস্তববস্তুর সহিত সমান ওজনে তুলনা করা যায় এবং শিল্পীর কারিগরিই প্রশংসার বিষয় হয়, এ ক্ষেত্রে কল্পনা বা ভাবের কোনো কথাই উঠিবে না। এই যান্ত্রিক কৌশল আলোকচিত্র-শিল্পীর এবং অনেকাংশে আরো প্রশংসনীয় ভাবে ইহা কৃষ্ণনগরের

মূর্তিকারদের আছে।

কিন্তু শিল্পসৃষ্টিতে এই কৌশলের আসন খুব উচ্চে নহে। যথার্থ শিল্পী ইহার-জন্য লালায়িত নহেন এবং তিনি কখনো অনুকরণ করিতে চান না। আবার অনেক স্থলে দেখা যায়, যদি অনুকরণ সার্থক হয় আমরা তাহার মধ্যে শিল্পরস পাইবার বদলে বস্তুটিকে বাস্তববস্তুর মতো বিচার করি এবং আমাদের মনে বস্তুটির প্রতিক্রিয়া কার্যকরী ভাবে আনিয়া দেয়; বহু তৈলচিত্র দেখিয়াই আমাদের মনে সাদৃশ্য সম্বন্ধে বিচার জাগিয়া ওঠে, ছবিটির ভাবলাবণ্য আমরা ভুলিয়া যাই। এক বিখ্যাত অভিনেতার দুর্বৃত্তের ভূমিকা অভিনয় দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার প্রতি চটিজুতা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার যথার্থ শিল্প-রসানুভূতি না জাগিয়া কার্যকরী বৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল, তিনি শিল্পের সত্যকে বাস্তবের সত্য রূপে দেখিয়াছিলেন। এইরূপ অনুভূতির পার্থক্য যাহাতে না ঘটে সেইজন্য অভিনয়মঞ্চ করা হয় এবং ছবিতে ফ্রেম দিয়া তাহাদের বাস্তবজগত হইতে দূরে রাখা হয়।

এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে, শিল্প অনুকরণ নহে। তবে কি ইহা বিশুদ্ধ সৃষ্টি? যেমন শিশু কল্পনায় নানাপ্রকার খেলা করে, ছোটো একটি কাঠি হাতে লইয়া কখনো তলোয়ার, কখনো বন্দুক, কখনো-বা ছিপটি এবং আরো কত-কি বস্তুর ভঙ্গিতে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়— সেইরূপ শিল্পীও কি অবাধ কল্পনায় গা ভাসাইয়া যাহা-তাহা সৃষ্টি করিয়া চলেন? শিল্প ও ক্রীড়ার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে; দুইটিই স্বাধীন কল্পনারাজ্য গড়িয়া তুলে এবং দুইটিতেই মানুষের উদ্‌বৃত্ত শক্তির সদ্‌ব্যবহার হয়। কিন্তু এই দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে, কারণ শিশুর কল্পনার খেলার কোনো দর্শক থাকে না এবং শিশু অপরকে দেখাইবার জন্য খেলে না, সেইজন্য তাহার খেলার মধ্যে কোনো স্থায়ীবস্তু রচনা করে না। শিশু তাহার খেলাকে অপরের বোধগম্য করিতে চায় না বা সে স্পৃহাও তাহার নাই। কিন্তু অপর পক্ষে শিল্পে এই ভাবগুলিই পরিস্ফুট, শিল্পীর মনে সর্বদাই শ্রোতা

বা দর্শকের আসন রহিয়াছে। শিল্পী কেবল নিজের অবসর বা ভাব-বিনোদনের জন্য শিল্পরচনা করেন না; শিল্পী তাঁহার সৃষ্টি যাহাতে অপরের মনে আসন পায় সর্বদাই তাহার জন্য ব্যগ্র, তিনি তাঁহার সৃষ্টি অপরের সম্মুখে ধরিয়া তাহারই মধ্য দিয়া কিছু বলিতে চান যাহা অপরের অনুভূতিতেও ধরা পড়িবে। শিল্পী তাই সার্বভৌমতা চান; কিন্তু শিশুর খেলা তাহা চায় না, পায়ও না। এই-জন্য শিল্প স্বাধীন সৃষ্টি হইলেও প্রকৃতি হইতে একেবারে ভিন্ন হইতে পারে না। শিল্প প্রকৃতির প্রতিলিপি নহে, অথচ প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্নও নহে। সুতরাং শিল্পী অনুকরণ করেন না, কিন্তু প্রকৃতি হইতেই সামগ্রী আহরণ করিয়া তাহাকে নিজের ভাব-ভাবনা দ্বারা রূপান্তরিত রূপে প্রকাশ করেন। যদি শিল্পী প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিতেন তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টি অপরের মনে আবেদন জাগাইত না। এইজন্যই শিল্পীর নিজস্ব স্বাধীন সৃষ্টির মধ্যেও কিছু সহজ সাধারণ প্রাকৃতিক বিষয় থাকা আবশ্যক। প্রকৃতি সকলেরই জানা এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়াই শিল্পী শিল্পরচনা করেন এবং তাহা করেন বলিয়াই তাঁহার সৃষ্টি অনা-সৃষ্টিতে পর্যবসিত হয় না।

শিল্পীর ব্যক্তিত্ব

শিল্পসৃষ্টি বা রূপসৃষ্টির মধ্যে আমরা সাধারণত শিল্পীকে খুঁজি, অর্থাৎ আমরা শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের খবর, পছন্দ-অপছন্দ-মতামত খুঁজি তাঁহার সৃষ্টিতে। কিন্তু ইহা ভুল। বড়ো শিল্পী তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা লেখেন না, তিনি নৈর্ব্যক্তিক। শেক্সপীয়রের নাটক-কবিতা হইতে কবির জীবন সম্বন্ধে কোনো ধারণা খাড়া করা যায় না, এই প্রচেষ্টা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ব্যর্থ হইয়াছেন। কবি তাঁহার কল্পনা ও সহানুভূতি দিয়া সকল ভাব-ভাবনার সহিত নিজেকে সাময়িকভাবে একীভূত করেন এবং তাঁহার রচনাকে ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনা

মনে করেন না। আপনার মধ্য হইতে বিশ্বজনীন অনুভূতিগুলিকেই কবি সর্বসাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করেন এবং এইভাবেই সমষ্টির কাছে ব্যক্তিকে সমর্পণ করিয়া তিনি শিল্পের উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। শিল্পী একজন বিশেষ মানুষ হিসাবে তাঁহার ধ্যান-ধারণা লইয়া শিল্পরচনায় প্রবৃত্ত হন না— তিনি মানুষ-জাতির প্রতিনিধি হইয়া বা একটি সচেতন কেন্দ্র হইয়া রচনাকার্যে প্রবৃত্ত হন, সেই শিল্পসৃষ্টির আবেদন তাই সকল দিকেই ছড়াইয়া পড়ে। তাহা বলিয়া শিল্পী তাঁহার শিল্পরচনার বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করেন না। মনে রাখিতে হইবে, শিল্পীর বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য তাঁহার ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে না; শিল্পীর শিল্পরচনার বৈশিষ্ট্য তাঁহার ব্যক্তিগত মতামত বা ধ্যানধারণায় খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না, এই বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য নির্ভর করে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশপ্রণালীর উপর।

এ ক্ষেত্রে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে— তবে কি শিল্পী অভিনেতার মতো মিথ্যা ভান করেন, তিনি যাহা বলিতেছেন তাহার সহিত শিল্পীর আন্তরিকতা বা সত্যকার মনের যোগ নাই? একভাবে ইহা সত্য। তাঁহার রচনায় শিল্পী সাময়িক ভাবে কোনো ভাবভাবনার সহিত সহানুভূতি দেখান এবং দর্শক বা শ্রোতারাও তাহাতে যোগ দেন। ইহাকে কিন্তু মিথ্যা ভান বলা চলে না, কারণ শিল্পী ও দর্শক উভয়েই জানেন যে, এই ক্ষণিক সহানুভূতি কেবলমাত্র কল্পনায়, বাস্তব ব্যবহারে নহে। কাহারো দুঃখে যদি আমরা সত্য কাতর না হইয়া মিথ্যা দুঃখের ভান দেখাই তাহা হইলে আমাদের মিথ্যাচার হইবে। কিন্তু অভিনয় দেখিতে গিয়া যদি ঐরূপ সহানুভূতির ভান আমাদের মনে আসে যাহা অভিনেতা ও নাট্যকারও করিতেছেন, তাহাতে আমাদের মিথ্যাচার হয় না। কারণ এখানে সকলেই জানেন যে আমরা ভানই করিতেছি এবং তাহাতেই আনন্দ পাইতেছি; ইহাতে কাহাকেও বিশ্বাস করিতেও বলা হয় না, সুতরাং ইহাকে প্রতারণা বলা যায় না। এই ক্ষণিক সহানুভূতি বা বিশ্বাসের ভান

আপনিই জন্মে। যদি সত্য সত্য বিশ্বাস বা সহানুভূতি দেখা দেয়, যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চটিজুতা নিক্ষেপ করার বেলা দেখা গিয়াছিল তাহা হইলে কিন্তু সৌন্দর্যবোধ নষ্ট হইয়া যায়, কার্যকরী বুদ্ধি বা বাস্তবচেতনা জাগ্রত হইয়া কল্পনারাজ্যকে এক পলকে লুপ্ত করে। এইরূপ ক্ষণিক অর্ধবিশ্বাস গড়িয়া তুলিতে হইলে শিল্পীকে তাঁহার ভাবগুলি বুদ্ধি দিয়া সংযত রাখিতে হয়। ভাবগুলি যদি শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের একান্ত নিজস্ব হয় তাহা হইলে তাহাদের বাস্তবতা ও তীব্রতা এত অধিক হইতে পারে যে শিল্পী তাহাদের মনন করিতে সমর্থ নাও হইতে পারেন, বরং তাহাদের দ্বারা চালিত হইয়া ভাবের বন্যাই শুধু আনিতে পারেন। এইরূপ শিল্পসৃষ্টি সার্থক হয় না, ইহাতে কেবলমাত্র বেগই পাওয়া যায়, স্থিতি বা সামঞ্জস্য থাকে না। বড়ো শিল্পীরা তাঁহাদের রচনায় এই অসংযম হইতে মুক্ত, কোনো ভাবকেই তাঁহারা নিজস্ব অনুভূতির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখেন না এবং কোনো আবেগকে প্রশ্রয় দিয়া বড়ো করিয়া দেখান না। সকল ভাবকেই তাঁহাদের শিল্পের সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করেন এবং সেগুলিকে মনন এবং প্রকাশ করিয়াই আনন্দ পান, বাস্তব রূপে উপভোগ করেন না। এইভাবে শিল্পী যদি নিজস্ব তীব্রতর অনুভূতিগুলিকে বাদ দিয়া অপরাপর ভাবের সহিত কল্পনায় যুক্ত হইয়া তাহাদের মনন ও প্রকাশ করেন তাহা হইলে তাহার ফল আরো মহৎ এবং সুন্দর হয়। সুতরাং শিল্পী নৈর্ব্যক্তিক হইলেই শিল্পের লাভ।

শিল্পে বিচারবুদ্ধি ও প্রেরণার স্থান

শিল্পে বিচারবুদ্ধি ও প্রেরণার স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে শিল্পীদের মধ্যেও মতভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ প্রেরণায় বিশ্বাসী; তাঁহারা বলেন যে প্রেরণা বিদ্যুতের ঝলকের মতো আসিয়াই চলিয়া যায়, তাহার উপর বিচারবুদ্ধির কোনো প্রভাব নাই এবং বিচারবুদ্ধির উপস্থিতি শিল্পের ক্ষতিই করে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও ইংরেজ কবি শেলী এই মতে বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে ইংরেজ কবিদ্বয় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোলরিজ মনে করেন যে, কবির বিচারবুদ্ধি তাঁহার শিল্পসাধনার সহায়ক এবং ভাব-সকলকে মনন করিতে বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন আছে।

যে ক্ষেত্রে শিল্পীরা নিজেরাই এ বিষয়ে একমত নহেন সে ক্ষেত্রে আমাদের অধিক বলিবার কিছু নাই। তবু মনে হয় আমরা একটি মধ্যপথ ধরিতে পারি অর্থাৎ আমরা মানিয়া লইব যে শিল্প-সাধনায় প্রেরণা এবং বিচারবুদ্ধি দুইয়েরই প্রয়োজন। যাহাকে প্রেরণা বলা হয় তাহা কোনো ভৌতিক ব্যাপার নহে; মনে হয়, বহুকালের চিন্তা ও ভাবরাশি ইহার পিছনে থাকে। কোনো-এক মুহূর্তে চৈতন্য হঠাৎ সজাগ হইলে অতিদ্রুত এই-সকল চিন্তা ও ভাবরাশির সারবস্তুটি প্রকাশলাভ করে, যেমন কোনো-এক সন্ধ্যায় জুঁইফুলের কুঁড়িটি হঠাৎ বিকশিত হইয়া ওঠে। শিল্পীর একাগ্রতার চাপে তাঁহার মনের অনেক কথাই, যাহা সাধারণত মনের অবচেতন স্তরে রুদ্ধ থাকে, হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে। এই-সকল ভাব-ভাবনার ফললাভ কোনো-একটি শুভক্ষণের প্রেরণার উপরেই কেবলমাত্র নির্ভর করে না, শিল্পীর দীর্ঘকালের সাধনাও ইহার অনেকাংশে সহায়। প্রেরণার তীব্রবেগে শিল্পীর সুপ্ত অর্ধসুপ্ত চিন্তা ও আবেগরাশিকে তাড়া দিয়া বাহির করা চাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিচারবুদ্ধিও প্রয়োজন। ইংরেজ কবি কীট্‌স্ এই দুই বস্তুকেই মানিয়া লইয়াছিলেন। জার্মান দার্শনিক কাণ্টের মতে প্রেরণা সৃষ্টির অবাধ উৎস খুলিয়া দেয় এবং বিচারবুদ্ধি সেই সৃষ্টিকে সংহত করে। গতির সহিত

স্থৈর্যের যোগ না ঘটিলে শিল্প সার্থক হয় না, সুতরাং প্রেরণা ও বিচারবুদ্ধি উভয়েরই স্থান শিল্পে স্বীকার্য।

শিল্পের সার্থকতা ও আনন্দদান

আমাদের জীবনে শিল্পের সার্থকতা কী, এরূপ একটি প্রশ্ন হইতে পারে। এই কথার উত্তরে প্রথমেই মনে হয়, শিল্প আমাদের আনন্দ দেয়; আমরা নৃত্য গান চিত্র ভাস্কর্য দেখিয়া শুনিয়া বা পড়িয়া আনন্দ পাই। কিন্তু এই উত্তর ঠিক নহে, কারণ সুখের জন্য যদি শিল্পচর্চা করি তাহা হইলে এই সুখ বা আনন্দ অন্য-সকল সুখ হইতে ভিন্ন, তাহা কিরূপে বলিব। খাদ্যবস্তু-আস্বাদনের সুখ হইতে শিল্পরস-উপভোগের আনন্দ কি ভিন্ন নহে? যদি ধরা যায় যে, শিল্পের আনন্দ বলিয়া একটি বিশেষ প্রকারের সুখ আছে তাহা হইলে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল না, কেবল একই কথা ঘুরাইয়া বলা হইল। আমাদের যদি বলিতে হয় যে, শিল্পের আনন্দ বলিয়া কোনো বিশেষ প্রকারের সুখ নাই, সকল সুখই সুখ, তাহাদের জাতিভেদ করা চলে না তাহা হইলে কিন্তু শিল্পবস্তু খাদ্যবস্তুর গোষ্ঠীতে পড়িয়া যায়— যাহা আমরা কোনোমতেই ভাবিতে পারি না।

এখন এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে এই কথাই আমাদের বিচার্য যে, শিল্পের সত্য সার্থকতা আমাদের জীবনে কোন্খানে? দেখা যায়, মানুষের দৈহিক মানসিক সমস্ত স্বাধীন ক্রিয়াই তাহাকে আনন্দ দেয়, সুতরাং আনন্দদানে শিল্পের বৈশিষ্ট্য বা সার্থকতা নহে অর্থাৎ শিল্পের সার্থকতা সুখদানে নিহিত নহে। প্রত্যেক স্বাধীন ক্রিয়ার একটি-না-একটি সার্থকতা আছে এবং সুখ সন্তোষ বা আনন্দ সকল সুসম্পন্ন ক্রিয়ারই শেষে ফলস্বরূপ আসে। এই সুখ তৃপ্তি বা আনন্দ কোনো-একটি বিশেষ ক্রিয়ার ফলমাত্র নহে বা আমাদের দৈহিক এবং মানসিক ক্রিয়াগুলির মধ্যে কোনো বিশেষ একটিকে শুধু সুখ-উৎপাদনকারী

বলা চলে না, বরং যে-কোনো ক্রিয়াই সুসম্পন্ন হইলে তাহার ফলস্বরূপ আনন্দ দেখা দেয়। সুতরাং শিল্প সুখ দেয় কথাটি সত্য হইলেও শিল্পকে উহার দ্বারা অপর সকল ক্রিয়ার সহিত— যেমন ভক্তি ভালোবাসা অধ্যয়ন ক্রীড়া— মিশাইয়া ফেলিতে পারি না। শিল্পের নিশ্চয় কোনো বৈশিষ্ট্য আছে যাহার দ্বারা সে অপর ক্রিয়াগুলি হইতে স্বতন্ত্র। যেমন হাত পা চোখ মুখ সকল অঙ্গেরই বিশেষ বিশেষ সার্থকতা বা ধর্ম আছে এবং তাহা হইতেই ঐ অঙ্গগুলির বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি বা স্বভাব বোঝা যায়। সেইরূপ শিল্পচর্চা, অধ্যয়ন, ক্রীড়া ইত্যাদির বিশেষ বিশেষ সার্থকতা আছে, যেগুলিকে না জানিতে পারিলে আমরা তাহাদের প্রত্যেককে অপর হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিতে পারিব না।

এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে, সুখ বা আনন্দ -দানে শিল্পের সার্থকতা বলিলে কোনো লাভ হয় না। কারণ শিল্পের প্রকৃত সার্থকতা কেবলমাত্র আনন্দদানে নিহিত নহে।

শিল্পের সার্থকতা ও শিক্ষাদান

যাঁহারা আনন্দলাভের জন্য শিল্পচর্চা করেন না তাঁহারা বলেন, শিক্ষাদানের জন্য শিল্পরচনা করা হয় অর্থাৎ শিক্ষাদানেই শিল্পের সার্থকতা। একটু চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব এই মতও ঠিক নহে। পূর্বেই আমরা বিচার করিয়া দেখিয়াছি, শিল্পের বিষয়বস্তুকে তাহার আধার হইতে ভিন্ন করিয়া দেখা ভুল, উহাদের সম্বন্ধ প্রাণের সহিত জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতোই অচ্ছেদ্য। এখন যাঁহারা শিল্পকে শিক্ষাদানের উপায় মনে করেন তাঁহারা শিল্পের বিষয়বস্তুর উপরেই জোর দেন এবং উহা দ্বারাই শিল্পের মূল্যবিচার করেন, ক্য[illegible] আধার কোনো শিক্ষা বহন করিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, কোনো নীতি[illegible]তার বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়াই কবি শিক্ষাদান করেন, ছন্দ

মিল প্রভৃতির মধ্য দিয়া নহে; সুতরাং শিল্পকে যদি শিক্ষাদানের উপায় মনে করা হয় তাহা হইলে তাহার অর্থকেই মুখ্য বলিয়া মানিতে হইবে। কিন্তু ইহা যে ভুল মীমাংসা তাহা আমরা বিচার করিয়া দেখিয়াছি। যদি শিল্পের সার্থকতা শিক্ষাদানেই হয় তাহা হইলে শিল্পকে বিজ্ঞান বা নীতিশাস্ত্র হইতে পৃথক করা যায় না। কিন্তু আমরা বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে, শিল্পসাধনা একটি স্বতন্ত্র জিনিস বা বিশেষ ক্রিয়া এবং ইহার কোনো বিশেষ সার্থকতা বা ধর্ম আছে। যদি শিক্ষাদানকে শিল্পের ধর্ম মনে করি তাহা হইলে সমস্যা আরো জটিল হইয়া ওঠে কারণ শিল্পের আবেদন সার্বভৌম এবং দেশকালের গণ্ডিমুক্ত। কিন্তু শিক্ষার আবেদন সেরূপ হয় না। ভারতের যে শিক্ষা বা আদর্শ ভারতের শিল্পে প্রকাশিত, তাহা আরবে বা ইউরোপে চলে না। প্রত্যেক কবি বা শিল্পীরই জীবন-দর্শন ভিন্ন ভিন্ন, অথচ আমরা দেখি শিল্পসৃষ্টি যেখানে সার্থক ও সুন্দর হইয়াছে সেখানে আদর্শের বা মতের পার্থক্য শিল্পরসগ্রহণের বাধা হয় না; সকল জাতি, সকল দেশের মানুষই তাহার আদর করে, এবং সেই শিল্পের রসাস্বাদনের সময় শিল্পের অর্থ বা বিষয়বস্তুর উপর আমরা জোর দিই না। যদি কোনো কবির কবিতায় শিক্ষাদানই মুখ্য হয় তাহা হইলে সেই কবিতা সার্থক শিল্প হইবে না এবং তাহার আবেদনও এই মতের অনুসরণকারী অল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে। সুতরাং শিক্ষাদান শিল্পের ধর্ম নহে বলা চলে।

কিন্তু শিল্প কুশিক্ষা প্রচার করে, ইহা মনে করা ভুল। বড়ো শিল্প সর্বদাই সুশিক্ষা দান করে, যদিও শিক্ষাদান করা তাহার কাজ নহে। প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, বড়ো শিল্পে ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দিয়া তাহাদের মনন করা হয়। এই মননের ফলে ভাবগুলি সম্বন্ধে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা জন্মে, আমরা সেগুলির প্রকৃতি জানিয়া সেগুলিকে জয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকি।

যদিও শিল্পে কোনো স্পষ্ট ভাষায় ভাবাবেগকে জয় করিতে শিক্ষা দেওয়া

হয় না, তবু পরোক্ষভাবে শিল্প আমাদের তাহাই শিখায় এবং এইজন্য শিল্পকে নীতিমূলক না বলিয়া নীতিসহায়ক বলা যায়।

শিল্পের সার্থকতা প্রকাশকার্যে

বহু বিচারের পর এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, শিল্পের কাজ সুখ বা শিক্ষা দেওয়া নহে। তবে ইহার কাজ বা সার্থকতা কি? এই সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা এই যে, শিল্প আমাদের ভাবগুলিকে প্রকাশ করে বা ভাষা দেয়। যেমন ক্ষুধা পাইলে আমরা খাই বা কৌতূহল হইলে বিষয়টিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করি, সেইরূপ কোনো ভাব বা আবেগের অনুভূতি জাগিলে আমরা তাহা প্রকাশ করিবার জন্য চঞ্চল হই এবং প্রকাশ করিতে পারিলেই সেই চঞ্চলতার বেদনা হইতে মুক্তি পাই। এই মুক্তিলাভের যে আনন্দ তাহাই শিল্পচর্চার ফল। কিন্তু যেহেতু আনন্দ প্রত্যেক সুসম্পন্ন ক্রিয়ারই ফলস্বরূপ সেইজন্য আনন্দকে শিল্পের বিশেষ উদ্দেশ্য বা সার্থকতা বলা যায় না। শিল্পের বিশেষ সার্থকতা তাই তাহার ভাব-ব্যঞ্জনায়। প্রকাশের ব্যাকুলতা আমরা সকলেই অনুভব করি. দুঃখ-সুখ প্রেম-ঘৃণা এই-সব ভাবগুলি যখন আমাদের অস্থির করে তখন আমরা বেদনা পাই। এই বেদনা হইতে মুক্তি দিতে পারে আমাদের ভাষা বা প্রকাশশক্তি। কবি তাই কবিতা লেখেন এবং সেই কবিতা যখন পাঠক পড়েন তখন তাঁহার মনেও ভাব জাগে। এইভাবে সেই ভাবের প্রকাশও সঙ্গে সঙ্গে হইতে থাকে, তাই পাঠকও আনন্দ পান। যেমন কবিতাতে ভাব অভিব্যক্ত হয় ভাষার দ্বারা সেইরূপ চিত্রে ভাব প্রকাশ পায় রেখা ও রঙে, ভাস্কর্যে পাথরের উপর খোদাই-কার্যের বিচিত্র কৌশলে, সংগীতে শব্দ ও সুরে, এবং নৃত্যে ভাব অভিব্যক্ত হয় দেহভঙ্গি দ্বারা। এই প্রকাশ যখন নিখুঁত হয় আনন্দও তখন পরিপূর্ণ হয় এবং তখনই আমরা শিল্পকে সার্থক ও সুন্দর বলি।

সৌন্দর্য এই পূর্ণপ্রকাশ ব্যতীত আর কিছু নহে। শিল্পে আমাদের ভাবের যেমন প্রকাশ দেখি, প্রকৃতিতেও কোনো কোনো সময় এক-একটি ভাবের সেইরূপ অভিব্যক্তি হইতে দেখি, এবং দেখি বলিয়াই প্রকৃতিকে সুন্দর মনে হয়। যাহার নিজের মনে ভাব নাই সে কাশ্মীর ভ্রমণ করিয়া আসিলেও আনন্দ পাইবে না। তাহার কাছে পাহাড়ের চূড়া আর সবুজ উপত্যকা, ক্ষিপ্রগতি নির্ঝরিণী বা ঘন পাইন-বনের সারি সবই সমান, এবং তাহার চোখে সবই অর্থহীন ও মূক। শিল্পীর চোখে প্রকৃতির রূপে যত বৈচিত্র্য ধরা পড়ে তাহা সবই শিল্পীর ভাবজগতেই থাকে; শিল্পী শুধু প্রকৃতিতে তাহার প্রকাশ দেখিতে পান এবং প্রকাশ হইতে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবগুলি সম্বন্ধে শিল্পী সচেতন হইয়া ওঠেন, বাহিরের বৈচিত্র্যে তাঁহার অন্তরজগতের বৈচিত্র্যের সন্ধান আনিয়া দেয়। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, শিল্পে ও প্রকৃতিতে মানুষের ভাবরাশির প্রকাশ হয় ইহাই শিল্পের সার্থকতা এবং শিল্প ও প্রকৃতির সকল সৌন্দর্যের রহস্য।

ভাবের আদান-প্রদান

এর পরে আমাদের আর-একটি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। শিল্পী তাঁহার ভাবের প্রকাশ করেন কথার ভাষায় বা রেখারঙের ভাষায়, কিংবা অপর কোনো শিল্পের ভাষায়। যে ভাবগুলি শিল্পী প্রকাশ করিতেছেন তাহা তাঁহারই, তবু তাহা কেমন করিয়া পাঠক বা দর্শকের মনেও আবেদন জাগায়? অর্থাৎ এখানে আমাদের বিচার করিতে হইবে যে, শিল্পী ও দর্শক বা পাঠকের মধ্যে কিভাবে যোগ স্থাপিত হয়।

প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, এই যোগ যদি স্থাপিত না হয় তাহা হইলে শিল্পীর প্রকাশকার্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়, কারণ প্রকাশের অর্থই অপরের কাছে প্রকাশ। প্রকাশ শুধু নিজের কাছে হইলে আনন্দও পাওয়া যাইত না,

সুতরাং এই যোগস্থাপন যাহাতে সম্ভব হয় সেইজন্য শিল্পীকে বিশ্বজনীন ভাবগুলি-কেই শিল্পরচনার সামগ্রী হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। যে ভাবাবেগ বা অনুভূতিগুলি একান্তভাবে ব্যক্তিগত তাহার মূল্য শিল্পে অধিক হইতে পারে না বরং উহা মনস্তত্ত্বে বিশেষভাবে আলোচিত হইতে পারে। তাঁহার শিল্পরচনায় শিল্পী সম্পূর্ণ স্বাধীন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে ভাবগুলি শিল্পী প্রকাশ করিতেছেন তাহা তিনি সাময়িকভাবে অনুভব করিলেও শিল্পীকে নৈর্ব্যক্তিক রহিতে হইবে ; কারণ সার্বভৌম ভাবগুলিই শিল্পীর ব্যঞ্জনার বিষয়। এ কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি। ইহা দেখা যায় যে, শিল্পের সার বিষয়বস্তুও সকল কালে সকল দেশেই কয়েকটি মূল মানব-হৃদয়াবেগ ব্যতীত আর-কিছু হয় না। সেই একই প্রেম-ঘৃণা ভয়-হিংসা অপত্যস্নেহ ও ঈশ্বরভক্তি এবং অপর দুই-একটি ভাবকে লইয়াই সব কবিতা সব ছবি ও সব ভাস্কর্য এবং সুন্দরের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু এরূপ প্রশ্নও হইতে পারে যে, তাহা হইলে শিল্পে এত মৌলিকতা কোথা হইতে আসে। শিল্পের মৌলিকতা তাহার বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করিয়া নহে, উহা তাহার প্রকাশভঙ্গিটির উপর নির্ভর করে। এই প্রকাশভঙ্গি কখনোই এই ভাবগুলিকে একেবারে নিঃশেষ করিয়া প্রকাশ করিবার মতো পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক শিল্পীই এই চিরপুরাতন ভাবগুলিকেই প্রকাশ-ভঙ্গি দ্বারা নব নব রূপ দেন। মানবহৃদয়ের চিরন্তন ভাবগুলির আদি-অন্ত কাহারো সম্পূর্ণ-গোচরীভূত হইতে পারে না। শিল্প স্পষ্টভাবে দুই-একটি কথাই বলে এবং আভাসে অনেক কথা বলে। শিল্পের অর্থ বা বিষয়বস্তুও তাই খুব গভীর মনে হয়। মনস্তত্ত্বে যাহাকে হিংসা বলি তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার আরো দুই-একটি অঙ্গ দেখিব। কিন্তু কাব্যে এই হিংসারই অন্যরকম আরো গভীর বৈচিত্র্যময় রূপ দেখি, কারণ কবি যাহা স্পষ্ট বলেন না তাহা আভাসে অনেক বেশি করিয়া বলেন। এই আভাসের ব্যঞ্জনা শিল্পকে গভীর করে এবং

প্রত্যেক মৌলিক রচনায় এই ব্যঞ্জনা নব নব রূপে প্রকাশিত হয়।

সুতরাং দেখিতে পাই যে, প্রকাশ তখনই সম্পূর্ণ যখন শিল্পীর চৈতন্যে সমাজ-মনের ভাবগুলি যাতায়াত করে। শিল্পীকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে চলিবে না, কারণ তাঁহাকে সমস্ত সমাজ-মনের কেন্দ্র হইয়া সামাজিক ভাবগুলি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। সবাকার সহিত শিল্পীর যোগ থাকা প্রয়োজন; নচেৎ শিল্পী সবার হইয়া ভাবপ্রকাশ করিতে পারিবেন না এবং তাঁহার প্রকাশকার্যও ব্যর্থ হইবে। প্রকাশকার্য সফল করিবার জন্য শিল্পীকে সামাজিক হইতে হইবে; কারণ প্রকাশকার্যের মধ্য দিয়াই শিল্পী সমাজের সহিত জড়িত হন এবং পাঠক বা দর্শকেরাও পরস্পরের সহিত সহানুভূতি দ্বারা ক্ষণকালের জন্যও একতা বোধ করেন। যখন আমরা অনেকে মিলিয়া কোনো নাটক বা ছবির প্রশংসা করি তখন সকলেই একটি মিলনসূত্রে আবদ্ধ হই, এবং সেই সূত্রটি নাট্যকার বা চিত্রকরকেও আমাদের সঙ্গে এক করে।

আমরা দেখিতেছি, কতকগুলি বিশ্বজনীন ভাবের উপর শিল্পের ব্যাপক আবেদন নির্ভর করে, কিন্তু ইহার জন্য প্রকাশপ্রণালীকেও সকলের বুঝিবার উপযুক্ত করা প্রয়োজন। দেখা যায়, কতকগুলি সংকেত বা প্রতীকের বিশেষ বিশেষ অর্থ আছে, যেমন কোনো-একটি ভাষার শব্দগুলির নানারকম অর্থ আছে, বাংলা ভাষায় পাত্র বলিলে একটি বিশেষ বস্তুকে বোঝায়, আবার তৈল বলিলে অপর-একটি বস্তুকে বোঝায়। সেইরূপ বিভিন্ন রেখার বিভিন্ন রকমের অর্থ— ইহা ভাষার ন্যায় সুস্পষ্ট না হইলেও ভাবের প্রকাশ করে। যেমন সরু বাঁকাচোরা রেখা শক্ত সোজা রেখা হইতে ভিন্ন এবং দুটি রেখাই পৃথক পৃথক ভাব জাগায় ও প্রকাশ করে। সেইরূপ রঙের সুরের ও দেহভঙ্গির বেলাতেও একই কথা। এই সংকেতগুলির অধিকাংশই সকলের বোধগম্য, সুতরাং ভাব ফুটাইয়া তোলা এইগুলিরই সুষ্ঠু প্রকাশের উপর নির্ভর করে। কেন-যে একটি বিশেষ শব্দ বা রেখারও সেই একটি বিশেষ অর্থই বোঝায় তাহা বলা যায় না। কেন কলস শব্দটি

একটি পাত্রকেই বোঝায় কোনো ফুল-ফলকে নহে এবং ঘোড়া শব্দটি উচ্চারণ করিলে কেন একটি বিশেষ চতুষ্পদ জন্তুকেই বোঝায়— এ-সব আমাদের জানা নেই। এই সংকেতগুলি কখন কেমন ভাবে মানবসমাজ প্রথম গ্রহণ করিল তাহা বলা কঠিন। কিন্তু সংকেত ব্যবহারের এই সাধারণ রীতি এবং শব্দগুলির চলতি অর্থ সমাজে আছে বলিয়াই প্রকাশকার্য সম্ভব হয়। এবং এই উপায়েই সুন্দরের সৃষ্টিও সম্ভব হয় এবং শিল্পী তাঁহার শিল্পসৃষ্টি দিয়া সমাজের সহিত ভাবালাপ করেন।

সৌন্দর্যের স্বরূপ

সৌন্দর্য কোনো বস্তুতে তাহার রঙ বা আকারের মতো লাগিয়া থাকে না। বস্তুর ভাবলাবণ্য অনুভবের দ্বারা সৌন্দর্যকে আমরা পাই এবং ইহা প্রকাশ-ক্রিয়ার উপলব্ধি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যখন একটি বস্তু কয়েকটি সাধারণবোধ্য সংকেত দ্বারা আমাদের কোনো হৃদয়বৃত্তিকে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করে তখন আমরা সেই বস্তুকে সুন্দর বলি। অথচ সে সময় সৌন্দর্যের অবস্থান সম্বন্ধে আমরা যে সচেতন থাকি তাহা নহে, সৌন্দর্যের অনুভূতিটি বস্তুটির সুন্দর প্রকাশে অথবা আমাদের মধ্য হইতেই পাই, তাহা ভাবি না। আমাদের সুন্দর লাগাকে আমরা বস্তুটির উপর আরোপ করি এবং বস্তুটিকেই সুন্দর মনে করি। আমাদের মনের প্রক্রিয়াগুলি আমাদের চোখে দৃশ্যমান নহে; তাহা যদি হইত তাহা আমাদের সৌন্দর্যোপলব্ধিতে বাধা উপস্থিত করিত। যেমন আমরা রজ্জুকে ভ্রম করিয়া সর্প দেখি এবং তখন বুঝিতে পারি না ঐ অনুভূতিটি আমাদের মনেই রহিয়াছে, বাহিরে নহে; সেইরূপ একভাবে সৌন্দর্যকেও একটি ভ্রম বা মায়া বলা যায়। কিন্তু যেহেতু এই মায়া চিরন্তন এবং বিশ্বজনীন (ক্ষণস্থায়ী নহে), সুতরাং ইহাকে এরূপ ছোটোভাবে উড়াইয়া দেওয়া যায় না, বরং সুন্দরকে

সত্যেরই সমান মূল্য দেওয়া যায়। সত্য শিব অর্থাৎ মঙ্গল এবং সুন্দর— এই তিনটি মানবজীবনের পরম আদর্শ; ইহাদের মধ্য দিয়াই বিশ্বদেবতাকে মানুষ দেখে। বিশ্ব-সৃষ্টিকার যে সুন্দরকে আমাদের সম্মুখে তাঁহার সৃষ্ট প্রকৃতির লীলায় মেলিয়া ধরিয়াছেন শিল্পী তাহাকেই নিজের রচনায় ধরিয়া রাখিতে চাহেন। আমাদের প্লাবিত করিয়া সুন্দরের লীলা এই অনন্ত প্রাণপ্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে, আনন্দের স্রোত বহিতেছে। এই সৌন্দর্যপ্রকাশের আনন্দে আমরা আত্মহারা হইয়া থাকিতে পারি, কিন্তু আমাদের অন্তরের আরো আনন্দ আছে। আমরা সত্যানুসরণ করিয়া বা ধর্মসাধনা করিয়া আনন্দ পাই এবং কর্তব্যকর্ম করিয়াও আনন্দ পাই। সুতরাং আমরা সর্বদাই প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করি না বা শিল্পচর্চা করিয়া জীবন কাটাই না। শুধু ভাবপ্রবণতায় মানুষের প্রকৃতিতে শৈথিল্য আসে। মানুষের চরিত্রে স্থৈর্য-বীর্য ও জ্ঞান-ধর্মেরও প্রয়োজন। এই সমস্তরকম গুণের সমন্বয়েই এবং ঈশ্বরদত্ত সর্বপ্রকার আনন্দের সুষ্ঠু সামঞ্জস্যে মানবজীবন সার্থক সুন্দর হয়। ইহার পরিচয় আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবনে দেখিতে পাই।

মহান্ সৌন্দর্য ও কুশ্রীতা

প্রকৃতির বিরাট বা ভয়াল রূপ দেখিলে সৌন্দর্যানুভূতি না হইয়া প্রথমে অনেক সময় আমাদের মনে ভয় ও বিরাগের সঞ্চার হয়; কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে একটি মহিম সৌন্দর্যের[১] অনুভূতি জাগিয়া ওঠে এবং তাহাতে আমরা অভিভূত হই। আকাশচুম্বী দিগন্তবিলম্বিত পর্বতশ্রেণী বা সীমাহীন গর্জনময় বিক্ষুব্ধ সমুদ্র

১ ইংরেজিতে ইহাকে sublime বলে। বাংলায় এমন কোনো একটি শব্দ প্রচলিত নাই যাহা ইহাকে প্রকাশ করে। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বলেন, সংস্কৃতে ‘বিরাট’ শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার করা যায়। অথর্ববেদে এইরূপ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

কিংবা গভীর রাত্রের স্তব্ধ আকাশে অসংখ্য তারাদল দেখিয়া আমাদের মনে এই মহিম সৌন্দর্যের অনুভূতি জাগিয়া ওঠে। এই ভাবটিকে সৌন্দর্যের অনুভূতি হইতে অনেকে পৃথক করিয়া দেখেন। ইহা কিন্তু ভুল। সৌন্দর্যের আনন্দভাব ও সৌন্দর্যের মহান্ ভাবের মধ্যে কেবলমাত্র পরিমাণের প্রভেদ— গুণের নহে। মহান্ সৌন্দর্যকে কঠিন সুন্দর বলা যায়, অর্থাৎ ইহা সেই শ্রেণীর সুন্দর যাহা আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর মনে করা কঠিন, কিন্তু কিছু পরেই অতি সুন্দর বলিয়া বোঝা যায়। একভাবে ইহাকে সৌন্দর্যের দুরূহ ভাবও বলা যায়। এই যে অসুন্দর মনে হওয়া— ইহার কারণ এই যে, প্রকৃতির বিরাট বা ভীষণ রূপগুলিতে আমরা প্রথম কোনো ভাবের প্রকাশ দেখি না, তার পরে তাহাতে আমরা মানবাত্মার মহত্ত্ব এবং মৃত্যুর ভীষণতা ও বিরাটত্বের ভাব (যাহা আমাদের সবার অন্তরেই থাকে) প্রকাশিত দেখি। এইখানে আমরা অসুন্দর কি, তাহারও বিচার করিতে পারি। অসুন্দরের বোধ তখনই আসে যখন কোনো সংকেত— যেমন শব্দ রেখা রঙ ইত্যাদি কোনো-একটি ভাবকে প্রকাশ করিতে গিয়া অকৃতকার্য হয়। কোনো কুৎসিত মুখ যদি ছবিতে ফটাইয়া তুলিতে চাই এবং ঠিক ভাবে মুখটির ভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে ছবিটি সুন্দর: অন্যথা ছবিটিতে যদি সেই মুখের যথার্থ ভাবটি না ফুটাইয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে সমস্ত ছবিটিই অসুন্দর ও বিরক্তিকর হইবে। অস্পষ্ট প্রকাশ বা প্রকাশের অক্ষম চেষ্টাই অসুন্দর।

এইরূপ দেখিতেছি যে, সুন্দর-অসুন্দর ভাবপ্রকাশের সাফল্য-অসাফল্যের উপর নির্ভর করে। যেখানে ভাব নাই এবং প্রকাশও নাই সেখানে সুন্দরও থাকিতে পারে না। যেখানে ভাব আছে অথচ প্রকাশ নাই, সেখানে ভাবকে না জানার জন্য অস্পষ্টতার বেদনা অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, অস্পষ্টতাই দুঃখ। ভাবপ্রকাশ করিতে গিয়া শিল্পী যখন অকৃতকার্য হয়, শিল্পীর সৃষ্টি যখন খানিক আলো খানিক ছায়ায় বিশৃঙ্খল হইয়া মনকে পীড়িত করে তখনই আমরা অসুন্দরকে অনুভব করি।

সত্য সুন্দর ও মঙ্গল

সত্য ও শিব বা মঙ্গলের উপলব্ধি কিভাবে সৌন্দর্যোপলব্ধি হইতে ভিন্ন তাহা জানা প্রয়োজন। সত্য শিব ও সুন্দরের আদর্শ মানুষকে মহনীয় করে এবং মানবজীবনে এই তিনটির মতো আর কিছুই মূল্যবান্ নহে এবং সকল বস্তুরই মূল্য এইগুলির মাপকাঠিতে নির্ণয় করা হয়। সত্য শিব ও সুন্দরের মধ্যে ঐক্য আছে, কিন্তু ইহারা এক নহে। কোনো-একটি পারমার্থিক নিত্যবস্তুই সত্য শিব ও সুন্দরের রূপ ধরিয়া মানুষের জ্ঞানগোচর হয় এবং এই তিনটি আলোকচিহ্নের নির্দেশ বাহিয়াই মানুষ পরমার্থের সন্ধানে বাহির হয়। সত্য সুন্দর ও মঙ্গল—এই তিনটি পথের পরস্পরের মধ্যে ভেদ কোথায় তাহা জানিতে হইবে। সত্যের পথে চলেন জ্ঞানীরা, সুন্দরের পথে চলেন শিল্পীরা এবং সাধক-মহাত্মারা চলেন মঙ্গলের পথ ধরিয়া। সত্যকে অনেক সময় সুন্দর বলা হয়, তখন সত্যকে সুন্দর বলি ভাবের বা উপলব্ধির সত্য হিসাবে ; কোনো তথ্য বা তত্ত্বকথার সত্য হইতে এই সত্য তখন ভিন্ন। আমাদের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগিলে আমরা সত্যকে চাই, যখন কোনো বস্তুকে যথাযথভাবে সেটি ঠিক কেমন জানিতে অনুসন্ধিৎসা জাগে তখনই সত্যকে চাই। এই অনুসন্ধিৎসা তৃপ্ত হইলে আনন্দ পাই, কিন্তু এই আনন্দ সৌন্দর্যোপলব্ধির আনন্দ হইতে ভিন্ন—যদিও আনন্দ মূলত সবই এক, শুধু ভাবে ভিন্ন। যখন সত্যকে চাই তখন কোনো বস্তুর সত্যটি ঠিক কেমন তাহাই জানিতে চাই, ঐ সত্যটি আমাদের কেমন লাগে এ কথা তখন অবান্তর। পক্ষান্তরে সুন্দরকে যখন উপলব্ধি করি তখনই আমাদের প্রকাশ-ইচ্ছা জাগিয়া ওঠে, সৌন্দর্যের ঐ বিশেষ রূপটি আমাদের কেমন লাগে ও কী ভাব প্রকাশ করে এই কথাই বলিতে চাই, বস্তুটির বাস্তবরূপ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তখন মনে আসে না। এই প্রকাশ-ইচ্ছাটি সফল হইলে সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয়। আরো একটু বিচার করিলেই দেখা যায়, যখন সত্যের সন্ধান করি তখন

আমাদের বুদ্ধি প্রত্যেক বস্তু বা তত্ত্বকে তাহার বাস্তবিক আবেষ্টনের মধ্যে যথাযথ ভাবে দেখিতে চায়, এবং সেই বস্তুটির সহিত সংসারের অপরাপর বস্তুর কার্যকারণ-সম্বন্ধ বিচার করিতে চাই। এইভাবে সমগ্র বস্তুটিকে তখন এক বিরাট সৃষ্টি-ব্যাপারের একটি অংশরূপে দেখি। সৌন্দর্যের সন্ধান যখন করি তখন কিন্তু মন-বস্তুটিকে অন্তরের সহিত মিলাইয়া দেখিতে চাই। তখন সৌন্দর্যের বিশেষ রূপটিকে তাহার বাস্তব আবেষ্টনী হইতে তুলিয়া লইয়া একটি স্বতন্ত্র সমগ্র সৃষ্টি রূপেই দেখিতে চাই। একটি প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের বৈজ্ঞানিক বিচার করিলে পদ্ম নামক ফুলটি ফুলগোষ্ঠীর কোন্ শ্রেণীতে পড়ে, তাহার উৎপত্তি ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা বা কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য তাহার পুষ্পজীবনের ইতিহাসে ধরা পড়িয়াছে এই-সকল তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক উদ্‌ঘাটিত করিবেন। পক্ষান্তরে শিল্পী ফুলটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সৃষ্টি রূপে উপলব্ধি করিয়া আনন্দলাভ করিবেন। প্রেমভাবকে বৈজ্ঞানিক যখন বিচার করিবেন তখন প্রেমকে মানব-হৃদয়বৃত্তি-সমূহের একটি বলিয়া ধরিবেন এবং বিশ্লেষণ করিবেন। এইরূপে আমরা প্রেমের বিভিন্ন মৌলিক অঙ্গ এবং তাহার উৎপত্তি ও সার্থকতার বাস্তব তত্ত্বগুলির বিচার ও গবেষণা করিতে পারি। অপরপক্ষে কবি প্রেমকে অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিয়া আনন্দ ও সৌন্দর্যের অনুভূতি দিয়া তাহাকে স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ রূপে নিজের রচনার মধ্যে প্রকাশ করিবেন। উপলব্ধি-শক্তি সৌন্দর্য-সাধনার বিশেষ সহায়। অনুভূতিই কবিকে মুগ্ধ এবং প্রকাশের জন্য আকুল করে।

এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত সত্য— বিজ্ঞানের সত্য না ভাবের সত্য— ইহার বিচার করিতে যাওয়া ভুল। কারণ এই দুটিকে পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিব কি দিয়া? দুইটিই বিভিন্ন স্তরের সত্য; একটি বুদ্ধির, অন্যটি অনুভূতির। একটিকে দিয়া অন্যটির বিচার করা যায় না— মানুষের তৃতীয় কোনো জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকিলে তাহার দ্বারা এই দুইটির তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হইত। বুদ্ধি অনুভূতির সত্যকে অবজ্ঞা করে, আবার অনুভূতির উপর

ভর করিয়াও বৈজ্ঞানিক সত্যকে ছোটো করা অনুচিত। বুদ্ধি এবং অনুভূতি উভয়কে একই পঙ্‌ক্তিতে স্থান দিতে হইবে, কারণ মর্যাদায় কেহ কাহারো অপেক্ষা ছোটো নহে।

মঙ্গলের ভাব তখনই আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয় যখন আমাদের মধ্যে সমাজচেতনা আসে এবং আমরা কোনো শুভ-সাধনে প্রবৃত্ত হই। এই শুভ-সাধনাকে একরূপ কার্যকরী বুদ্ধিও বলা যায়, কারণ ইহা আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করে। সত্য ও সুন্দরের ক্ষেত্রে কর্মপ্রবৃত্তি নিরুৎসুক থাকে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা শিল্পরচনায় বুদ্ধি ও অনুভূতিই অতি সক্রিয় থাকে। মঙ্গলসাধনের ক্ষেত্রে কিন্তু মানুষের ইচ্ছাশক্তি তাহার কর্মশক্তিকে জাগাইয়া মন ও আত্মার সহিত দেহকেও সক্রিয় করিয়া নিজের সকল শক্তি একত্র করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হয়।

শুভাশুভের ধারণা দেশে দেশে কালে কালে সমাজের অবস্থার অনুযায়ী পরিবর্তিত হইতে পারে, কিন্তু শুভের সাধনা সকল সময়েই মঙ্গল আনে। মঙ্গলের সাধনা তাই সত্য ও সুন্দরের সাধনার মতো নিস্পৃহ নহে, ইহা কর্মের সাধনা; এবং কর্মে প্রবৃত্ত হইলেই কোনো-একটি আদর্শে বিশ্বাস করিয়া তাহাকে বাস্তব-জগতে রূপায়ণ করিবার চেষ্টা আসে, যাহা নির্বিকার চিত্তে সম্ভব নহে। সমাজস্বার্থ ও আত্মোন্নতির সাধনাই মঙ্গলসাধনা এবং সাধক-মহাত্মারা এই মঙ্গলের সাধনা করিয়াই আনন্দ পান। মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাঁহাদের শুভব্রতে ব্রতী করে। কিসে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার ভার লাঘব হইবে সেই কথাই তাঁহারা সর্বদা চিন্তা করেন এবং তাঁহাদের সকল কর্মে মানুষের কল্যাণকেই ফুটাইয়া তুলিতে চান। ভগবানের অবতার রূপে যাঁহারা আমাদের কাছে পূজিত তাঁহারা নিজ নিজ জীবনকালে সময়োপযোগী নূতন পথ বা ধর্মমত আচরণ করিয়া সর্ব-সাধারণকে তাহা শিখাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য বুদ্ধ শঙ্কর ও পরমহংসদেব ভারতে মঙ্গলসাধনা করিয়াছিলেন। ইঁহারা যে-সত্যকে লাভ করিয়াছিলেন তাহা দর্শন

বা বিজ্ঞানের সত্য নহে, তাহা পারমার্থিক সত্য; ইহা তাঁহারা মঙ্গলের পথে পাইয়াছিলেন এবং এই সত্যকে কবি পান সুন্দরের পথে চলিয়া ও দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক পান সত্যের পথে চলিয়া।

কাব্যের সৌন্দর্য

এখন আমরা কয়েকটি বিশেষ শিল্পে সৌন্দর্যসৃষ্টি কিভাবে হয় তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। সৌন্দর্যসৃষ্টিতে কবির দান অতুলনীয়। প্রথমে কাব্যের বিষয় কিছু আলোচনা করা যাক। কাব্যে আক্ষরিক শব্দ বা কথা দিয়া ভাবপ্রকাশ করা হয়। পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, ভাবপ্রকাশ সার্থক হইলেই সৌন্দর্যসৃষ্টি হয়। সুতরাং কবিকে কথাশিল্পী বলা যায়, কারণ ছন্দোময় কথার সুনির্বাচিত সমাবেশে তিনি কবিতা রচনা করেন—চিত্রশিল্পী যেমন তাঁহার চিত্রসৃষ্টি করেন রেখা ও রঙের সুন্দর সমাহারের দ্বারা। সংস্কৃত কাব্যদর্শনে রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলা হইয়াছে, অর্থাৎ বাক্যগুলি এমন ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে সৌন্দর্যরসের উন্নতি হয়। সকল শিল্পের মতো কবিতারও বিষয়বস্তু ভাব। শব্দের অর্থ আছে এবং সেই অর্থ দ্বারা বিজ্ঞান ও দর্শনকে বোঝানো যায় অর্থাৎ চিন্তা প্রকাশ করা যায়। কিন্তু কবিতায় ব্যবহৃত নির্বাচিত শব্দগুলির সাধারণ অভিধানগত অর্থ ছাড়াও আর-একটি ভাবপ্রকাশক অর্থও থাকিবে এবং এই শব্দছন্দের ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিতের উপর ভাবের উদ্দীপনা এবং ভাবপ্রকাশ নির্ভর করে। কবিতার বিষয় চিন্তাপ্রধান নহে এবং যে ক্ষেত্রে কবিতা চিন্তাপ্রধান সেখানে ছন্দ মিল ইত্যাদি যথাযথ হইলেও কবিতা হিসাবে তাহার বিশেষ-কোনো মূল্য থাকে না। কবি তাঁহার কবিতায় অনেক চিন্তার অবতারণা করেন, কিন্তু সে-সকলই তিনি গভীর অনুভূতি দিয়া দেখেন, নিছক চিন্তার ফল তাহা নহে। অনুভূতির এই তীব্রতাই কবিতায় রসের সৃষ্টি করে,

নহিলে নিছক চিন্তার ভাবকে ছন্দ বা সুর দিলেও উহা আমাদের মনে আসন পায় না। ছন্দ, মিল, অলংকার প্রভৃতির সাহায্য কাব্যে ভাব ফুটাইবার জন্যই আবশ্যক। যখন কোনো হৃদয়াবেগ আমাদের চঞ্চল করে তখন আমাদের কথা-বার্তাতেও একটু সুর আসিয়া লাগে। সে সময় আমরা ঠিক স্বাভাবিক গদ্যছন্দে কথা কহিতে পারি না। কাব্যে তাই দর্শনতত্ত্ব বা নীতিতত্ত্বও কবির অনুভূতির রঙে রঞ্জিত হইয়াই প্রকাশিত হয়। দর্শনে যখন 'অসীম' শব্দটি ব্যবহার করি তখন আমাদের চোখের সমুখে কোনো ছবি ফুটে না কিংবা মনে কোনো ভাব জাগে না, তখন শুধু বুদ্ধি দিয়া রূপরসহীন 'অসীম' শব্দটির সংজ্ঞা মাত্র বুঝি। কিন্তু কবিতায় 'অসীম' কথাটির ভাবার্থ প্রথমেই আমাদের হৃদয়কে দোলা দেয়, আমরা যেন দূরদিগন্তকে চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে দেখি— অনন্ত-বিস্তারী নক্ষত্ররাজির নীচে সাত সমুদ্র তেরো নদী -পারের কোনো অদেখা রূপকথার রাজ্যের জন্য মন আকুল হয়। সুতরাং শব্দের সাধারণ আভিধানিক গদ্য অর্থই কাব্যে সব নহে, শব্দের যে আবেগজাগ্রত করিবার শক্তি আছে তাহারই অনুশীলনের ফল কবির কবিতা। এইজন্য কবিকে তাঁহার কবিতার অক্ষরগুলি অনুভূতি দিয়া যাচাই করিয়া চয়ন করিতে হয়। সুতরাং কবিতার শব্দগুলির ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার মূল্য তাহাদের অর্থের অপেক্ষা কম নহে—অধিক হইতে পারে। এইজন্যই কবিতাকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করিলে এমন-কি, নিজস্ব ভাষাতেই গদ্যার্থ করিলে কবিতার সৌন্দর্যরস অর্থাৎ তাহার প্রকাশশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এই কথাগুলি আমাদের অনুভবে আপনা হইতেই আসে : রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'য় দার্শনিক তত্ত্বভাব এবং 'নৈবেদ্যে' নীতিতত্ত্বভাব দেখা যায়, কিন্তু তবু কবিতা হিসাবে ইহাদের তুলনা পাওয়া যায় না কেন? এই ভালো-লাগা কবিতাগুলি ভাবনার জন্য নহে, ভাবের জন্য। 'বলাকা'য় বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবজীবনের যে ক্ষণিকতাকে কবি দেখাইয়াছেন তাহা বৌদ্ধিক ক্ষণিক-বাদের দর্শন নহে। 'বলাকা'র কবিতার ভাবগুলিকে যদি তাহাদের ছন্দ-মিল-

বর্জিত করিয়া খুব দার্শনিক ভাষায় পুনর্লিখিত করা যায় তাহা হইলে তাহারা সে ভাব প্রকাশ করিবে না যাহা কবিতায় হইয়াছে। 'নৈবেদ্যে'র কবিতা সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যায়। কবি তাঁহার হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করেন এবং তাহার ভাবানুভূতি যদি কোনো নৈতিক বা দার্শনিক ধারণা অবলম্বন করিয়া জাগ্রত হয় তাহা হইলে ঐ ধারণাগুলিরও তাঁহার কাব্যরচনায় স্থান থাকিবে, তবে রূপান্তরিত ভাবে। দর্শন বা নীতিতত্ত্বের রূপ লইয়া ভাবগুলি কবিতায় আসে না, সুতরাং দর্শন বা নীতিশাস্ত্রের বিচারপ্রণালী দিয়া তাহাদের মূল্যনির্ণয় করা চলে না। ভাবগুলির সত্যাসত্যের পরিমাপ কবিতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে হয় না, অনুভূতি বা উপলব্ধি শক্তির তারতম্য অনুসারে হয়। অর্থাৎ কাব্যের সত্যে ও জ্ঞানের সত্যে ভিত্তিগত প্রভেদ আছে।

ভাবপ্রকাশের কয়েকটি সাধারণ রীতি আছে। রচনার মধ্যে ঐক্য ও বৈচিত্র্য দুই আছে এবং বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে এই ঐক্য স্থাপন করাই রচনার উদ্দেশ্য। যে ভাবটিকে প্রকাশ করিতে চাই তাহার নিজস্ব আবেদন থাকিতে পারে, না-ও থাকিতে পারে; যেমন প্রেম-ভক্তি আমরা ভালোবাসি কিন্তু হিংসা-কপটতা চাই না। কাব্যে কিন্তু সকল ভাবই স্থান পায়; সুতরাং কাব্যের আবেদন বিষয়বস্তু অপেক্ষা তাহার রচনাভঙ্গির উপরই বেশি নির্ভর করে। ভাবপ্রকাশেই সৌন্দর্যের সৃষ্টি এবং তাহাতেই আনন্দ। সুতরাং প্রকাশপদ্ধতিটি কবির অনুশীলন করা চাই। অভ্যাস ও অনুশীলন-দ্বারা খানিকটা আয়ত্ত করা অসম্ভব নহে, কিন্তু সাধারণত কবিমাত্রেরই সহজাত প্রকাশক্ষমতা থাকে। কাব্যপ্রতিভা অনুসারে প্রকাশক্ষমতা বেশি-কম হয়। সার্থক রচনায় সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি সংগতি সুন্দরভাবে বিরাজ করে। বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায়, রচনায় বৈচিত্র্যসৃষ্টি এবং ঐক্যস্থাপনের কতকগুলি বিশেষ উপায় আছে; সেইগুলির সুষ্ঠু সাধনেই সর্বাঙ্গসুন্দর রচনার পত্তন হয়। বৈচিত্র্যসৃষ্টির মুখ্য উপায় তিনটি—প্রথমত বিষয়বস্তুর পরিবর্তন। এইটি সার্থক কবিতায় এবং নাটকে

বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। যেমন 'শা-জাহানে'—

মিথ্যা কথা! কে বলে যে ভোল নাই?
কে বলে রে খোল নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার?

এইখানে কবিতার প্রথম ভাবগুলির পরিবর্তন হইল, পাঠক বৈচিত্র্যের আস্বাদ পাইলেন। নাটকে এই বৈচিত্র্য প্রায় প্রতি পট-পরিবর্তনের সঙ্গেই দেখা যায়। বৈচিত্র্যসৃষ্টির দ্বিতীয় উপায় হইতেছে বৈপরীত্য। দুইটি বিপরীত ভাব যেমন প্রেম ও হিংসা পাশাপাশি রাখিয়া ইহার প্রকাশ হয়। 'অভিসার' কবিতায় সন্ন্যাসী প্রাচীরতলের ধূলিতে সুপ্ত, সেই সময় 'যৌবনমদমত্তা' নগরীর নটীর নূপুরশিঞ্জিত চরণ সন্ন্যাসীর বুকে বাজিল। এইখানে বৈপরীত্যের দৃষ্টান্ত। এক দিকে ত্যাগের রূপ, অন্য দিকে ভোগের। এই কবিতা হইতেই দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যখন দেখি সেই নটী পুরপরিখার বাহিরে পরিত্যক্তা, তাহার সর্বাঙ্গ মারীগুটিকায় আচ্ছন্ন। তখনই প্রথম ছবির সহিত দ্বিতীয় ছবি মিলাইয়া লইতে মন যায় এবং দারুণ বৈপরীত্যের আঘাত পাই। কবি অনেক সময় একটি লাইনেই এই বৈপরীত্য ধরিয়া দেন; যেমন 'শা-জাহান' কবিতায়—

একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

এখানে যেন অনন্তের পটভূমিকায় দেখি একটি ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দু। নাটকে এই বৈপরীত্য পাশাপাশি দুইরকম চরিত্র চিত্রণ দ্বারা হইয়া থাকে—একটি হয়তো সরলচেতা ওথেলো, অন্যটি কুটিল ইয়াগো। বৈচিত্র্যসৃষ্টির তৃতীয় উপায় ছন্দ। ছন্দ দিয়া ধ্বনিগুলি একটি বিশেষ নিয়মানুসারে মাপ বা তাল রাখিয়া পরিবর্তিত হয়

এখন ঐক্যস্থাপনের উপায়গুলি আলোচনা করা যাক। প্রথমত বিভিন্ন ভাবের মধ্যে কোনো একটিমাত্র ভাবের উপর জোর দিয়া অর্থাৎ তাহাকে মুখ্যভাবে প্রকাশ করিয়া ঐক্যস্থাপনা করা যায়। যেমন 'শা-জাহান' কবিতায় জীবনের ক্ষণস্থায়িতা এবং সম্পূর্ণ ত্যাগের ভাব লইয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লওয়াই মুখ্যভাব এবং সেইটিকেই বিশেষ ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। অন্যান্য ভাবগুলি, যেমন শা-জাহানের প্রেম, ভগ্নপ্রাসাদের শূন্যতা ইত্যাদিকে গৌণ করা হইয়াছে; 'চাণক্য' নাটকে যেমন প্রতিহিংসার ভাবকেই প্রধান করা হইয়াছে এবং সেই ভাবটিই প্রাণে বেশি করিয়া বাজে। চরিত্রগুলির মধ্যে চাণক্য— যিনি নাটকের নায়ক— চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠেন। ঐক্যস্থাপনের দ্বিতীয় পথ হইতেছে ঐকতান সৃষ্টি করা। রচনার মধ্যে এমন-একটি আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে যাহা দ্বারা সমস্ত বৈচিত্র্যই একটি সংগতিতে মিশে। ইহা শব্দের চয়ন এবং ধ্বনিবিন্যাসের উপর নির্ভর করে। ভূতের গল্পে যেমন আবহাওয়াকে ভুতুড়ে করিয়া দেওয়া হয় এবং কোনো বীররসের কাব্যে যেমন তলোয়ারের ঝংকার শোনা যায়। ভারসমতা ঐক্যস্থাপনের তৃতীয় উপায়। ভাবগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে, যেমন ছবির বিষয়বস্তুর দুই দিকে ওজন সমান রাখিতে হয়।

উল্লিখিত প্রণালীতে কবি ভাবপ্রকাশে সমর্থ হন এবং ইহাদের সুষ্ঠু সাধনে তাঁহার রচনায় সৌন্দর্যসৃষ্টি সার্থক হয়। কবিতায় ভাষার অলংকারের প্রয়োজন হয় ভাবকে প্রকাশ করিবার জন্যই, ইহা মিথ্যা আড়ম্বর নহে। উপমা ও রূপকের ব্যবহার গদ্যে বিশেষ হয় না, কারণ সেখানে অর্থ লইয়াই আমাদের কারবার। কাব্য ভাবপ্রকাশেরই সাধনা, তাহা সাধারণ আভিধানিক গদ্যের ভাষায় ফোটে না; ছন্দ মিল ধ্বনি ব্যতীত অলংকারের সাহায্যও প্রয়োজন হয়। সন্ধ্যার রূপ দেখিয়া মনে যে ভাব আসে তাহা কি কোনো মনস্তত্ত্ববিদের ভাষায় পাইব, যেমন পাইয়াছি এই কবিতায়—

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার-আঁচল-খসা
হাতে দীপশিখা—
দিনের কল্লোল-'পর টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা।

এবং ক্লান্তির ভাবটুকুর প্রকাশ হইয়াছে উপমার সাহায্যে—

ক্লান্তি টানে অঙ্গ মম প্রিয়ার মিনতি সম

আবার অনাবশ্যক উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরায় যে উদাস বৈরাগ্যের ভাব, উজ্জ্বল উপমার সাহায্যে কত সহজেই তাহা প্রকাশ হইয়াছে—

আমি শরৎশেষের মেঘের মতো
তোমার গগন-কোণে
সদাই ফিরি অকারণে।

কাব্যে কোনো বস্তুর হুবহু বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই। সেই বস্তুটির সহিত মানবহৃদয়ের সংযোগটিকে প্রকাশ করা অর্থাৎ সেই বস্তুটির ছায়া মানুষের ভাবরাজ্যে কিভাবে পড়ে তাহা প্রকাশ করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। সুতরাং কাব্যে তাহার বর্ণনা করিতে হইলে অর্থাৎ ভাবটিকে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে ভাবময় ভাষার প্রয়োজন হয়। ইহা বিজ্ঞানের অর্থপ্রধান আবেগহীন নৈর্ব্যক্তিক ভাষার দ্বারা সম্ভব হয় না। কাব্যে এমন অনেক বস্তু বা জীবের অবতারণা করা হয় যাহা নিছক কাল্পনিক। কাল্পনিক বলিয়া যে এগুলি অর্থহীন তাহা নহে, কারণ বাস্তব জগতের সত্যবর্ণনা করা কাব্যের কার্য নহে, ভাবজগতের প্রকাশই কাব্যের কার্য; এবং ভাবজগতে এই-সব কাল্পনিক বস্তু বা জীব সত্য এবং তাহাদের অস্তিত্ব অনুভূতিতে। এইরূপে রূপকথার রাজ্য ও তাহার রাজারানী শিল্পরচনায় সত্য ও সজীব। নানা দেবদেবী ও অদ্ভুত জীবসকল— যেমন রাক্ষস ও গন্ধর্ব-কিন্নরদল— কাব্যে বাস্তব ও বাস্তব জগতের প্রাণীদের মতোই

আদরণীয়। কবি যখন বলেন—

দক্ষিণসমুদ্রপারে, তোমার প্রাসাদদ্বারে
হে জাগ্রত রানী

তখন সত্যই মনে হয় বহুদূরের সাগর পারাইয়া এমন কোনো অপরূপ প্রাসাদ আছে যেখানে কাব্যরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী কাব্যলক্ষ্মী বাস করেন। এই কঠোরা স্বামিনী ক্লান্তি বা বিশ্রাম জানেন না এবং অসময়ে অবসন্ন কবিকে প্রেরণার বার্তা পাঠান।

চিত্রকলা ও তাহার প্রকাশপদ্ধতি

আমাদের শাস্ত্রে বলে, একই বহু হইলেন ও এইরূপে সৃষ্টি সম্ভব হইল। সেইজন্য প্রথমেই রূপ আপনার বহু বৈচিত্র্য লইয়া আমাদের চোখে পড়ে। আমাদের শিল্পশাস্ত্রে বলে ছবির ছয় অঙ্গ, যথা, রূপভেদ প্রমাণ ভাব লাবণ্য সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ।

ভেদ লইয়া ছবি শুরু। এই ভেদ বা বৈচিত্র্য প্রধানত চিত্রের বিষয়বস্তুর মূলভাবটির আশেপাশে আরো কয়েকটি বিভিন্নপ্রকার ভাব সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রকাশ করা হয়। যেমন অবনীন্দ্রনাথের 'তাজ-নির্মাণ-স্বপ্ন' চিত্রে সম্রাট্ শা-জাহানের ধ্যানমগ্ন শান্ত মুখচ্ছবিটিই ঐ চিত্রের মূলভাব; কিন্তু আকাশে ম্লান প্রদোষালোকের পাশে একফালি শুভ্র চন্দ্রকলা ও নীচে যমুনার নীলজল চুম্বন করিয়া একটি অশ্রুবিন্দুর মতো মর্মর তাজ— এই-সব বিভিন্ন ভাবগুলিও সন্নিবিষ্ট হইয়া ছবিকে আরো আকর্ষণীয় করিয়াছে। মাইকেল এঞ্জেলোর 'লা-পিয়েটা' চিত্রেও এইরূপ বিভিন্ন মুখে বিভিন্ন ভাব সন্নিবেশের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। নাটকে এই বৈচিত্র্য বিচ্ছেদ-দৃশ্যের পটের পর মিলনের দৃশ্যপটের অবতারণা করিয়া আরো ভালোভাবে বোঝানো যায়। চিত্রে এই ভেদ ছন্দ এবং আলোছায়া বা রেখা-সমাবেশের বৈপরীত্য

দিয়াও দেখানো হয়। নানারীতির রেখা আছে, তন্মধ্যে সরল ও বক্র রেখাই প্রধান। বিভিন্ন রীতির রেখায় বিভিন্ন ভাব জাগায়। গাছের কাণ্ডটি সরলরেখায় নির্মিত, কিন্তু উপরের পত্রপুষ্পের মুকুটটি বক্র রেখায় রচিত। এইখানে প্রকৃতির রূপে রেখা-সমাবেশের বৈপরীত্য দেখি। চিত্রে এই রেখা-সমাবেশের রীতি চিত্রকর নিজে উদ্ভাবন করেন, কারণ রেখা-সমাবেশ চিত্ররচনার প্রধান বস্তু। সরলরেখা ও বাঁকারেখার মধ্যে একটা প্রকৃতিগত বিবাদের সম্পর্ক আছে এবং এই বিবাদ-রস অবলম্বন করিয়া একজাতীয় রেখা অন্যজাতীয় রেখার পোষকতা করে, যেমন বাঁকারেখার পাশে সরলরেখা অধিকতর ঋজু মনে হয়। আলংকারিক রীতির নক্‌শাতে বাঁকারেখা একেবারে বাদ দিয়া নিছক সরলরেখার আশ্রয়ে চিত্ররচনা করা যায়। চীন ও জাপানের চিত্রে রেখা-কল্পনার যথাযথতা বিশেষ-ভাবে বিদ্যমান। আলোছায়ার বৈপরীত্যও রেখাকে আশ্রয় করিয়া রচিত হয়। ছবিতে ছন্দলীলার সৃষ্টিও রেখার কাজ। চিত্রে ছন্দের গতিলীলা প্রত্যক্ষভাবে দেখানো সম্ভব নহে, কারণ চিত্রের বিষয়বস্তু নড়িতে পারে না। চিত্রে গতি বা ছন্দলীলা প্রকাশের একমাত্র উপায় বাঁকারেখা-সমষ্টির আশ্রয় গ্রহণ। পদ্মমৃণালের নমনীয় আঁকাবাঁকা রেখায় ছন্দ আছে। বাঁকারেখার প্রত্যেক বাঁকে একটা নির্দিষ্ট সংযত ভঙ্গি থাকে। এই সংযমই ছন্দের প্রাণ। চিত্রে রেখার নানা ভঙ্গির গতি একটা নিয়ম সংযম বা যতির নিগড়ে বাঁধিতে পারিলে ঐ-সমস্ত রেখার মালা ছন্দে নৃত্য করিয়া ওঠে। রেখার স্থান চিত্রে খুব বড়ো কারণ রেখা দ্বারাই চিত্রে বৈচিত্র্য এবং ছন্দলীলার সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক রেখার নিজস্ব একটি অর্থ আছে, কারণ রেখা হইতেই অক্ষরের ও রূপের সৃষ্টি। বৃত্তরেখায় আমরা পরিপূর্ণতার আভাস পাই, সরলরেখা উন্নতভাব জাগায়। বাস্তবিক রেখার গঠনরীতির উপর চিত্রের ভাব বহুলাংশে নির্ভর করে। 'কিউবিস্ট' শিল্পীগোষ্ঠী চতুষ্কোণ ও ত্রিকোণ খণ্ডের রেখা-সমাবেশে এক অভিনব চিত্ররচনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন।

ছবিতে এই ভেদ বা বৈচিত্র্যের সঙ্গেই পরিমাণ (প্রমাণ) বা ভারসাম্য যমক করিয়া রাখিতে হইবে। আপনাতেই সীমার সার্থকতা নাই, সুন্দরের জন্যই সীমা— এই কথা ছবিতে জানাইতে হইবে। সত্য ও সুন্দরের একই ধর্ম— এক দিকে তাহা রূপের বিশিষ্টতায় চারি দিক হইতে পৃথক ও আপনার মধ্যে বিচিত্র, আর-এক দিকে তাহা পরিমাণ বা সামঞ্জস্যের সুষমায় চারি দিকের সহিত ও আপনার মধ্যে সুন্দর সংগতিতে মিলিত। এই ভারসাম্য দ্বারা চিত্রের বিভিন্ন বিচিত্র ভাব সত্ত্বেও মূল একটি ভাবকেই মুখ্য করিয়া তোলা যায়। কোনো ছবিতে রেখা বা বস্তু -সমাবেশের বাহুল্যে চিত্রবস্তু যখন এক দিকে ঝুঁকিয়া যায় তখন তাহাকে ওজনে সমান করিবার জন্য অন্য দিকে কোনো নূতন বস্তুর সমাবেশ করিতে হয়। এই ভারসমতা রচনা-রীতির আসল কথা। ইউরোপীয় চিত্রে এই ভারসাম্য কোনো বিপরীত আকর্ষণের সামগ্রী চিত্রিত করিয়া দেখানো হয়, যেমন বটিচেল্লির 'ভেনাসের জন্ম' চিত্রে বিষয়বস্তুর ডান দিকের দেবকন্যাটির ভঙ্গি প্রায় স্থির কিন্তু বাম দিকের দেবকন্যাটির ছন্দচঞ্চল ভঙ্গি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ডান দিকের বস্তুগুলিকেও ভঙ্গির একঘেয়েমি প্রকাশ হইতে বাঁচাইতেছে। চীন ও জাপান দেশের চিত্রে এই ভারসাম্য শূন্যস্থান রাখিয়াও বা অপর কোনো বিপরীত আকর্ষণের বস্তু চিত্রিত না করিয়াও চমৎকার কৌশলে রক্ষা করা হয়, যেমন, কোরিনের 'মানুষ ও সারস' চিত্রে পটের চিত্রিত অংশের উপর প্রায় অর্ধেক স্থানের শূন্যতাকে পাশের দিকে কেবলমাত্র একটি সারগাঁথা অক্ষরের লম্বা মালা দিয়া মানুষটির প্রকাণ্ড মাথা ও অবয়বের ভারসাম্যে ও যথাযোগ্য ওজনে টানিয়া রাখা হইয়াছে।

চিত্রে আলো ও ছায়া ঠিক সমান ওজনে ভাগ হয় না, অর্থাৎ যদি কোনো বিশেষ মাপের আলোকের পাষাণ ভাঙিতে হয় তাহা হইলে ঐ পরিমাণের অধিক ছায়ার সংস্থাপন করিলে তবে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। যেমন, টিশিয়ানের

'লা-ভিয়ানা' চিত্রে যতখানি অংশ আলোকে উজ্জ্বল তাহার প্রায় তিনগুণ বেশি অংশ ছায়ায় নিমগ্ন করিয়া তবে চিত্রকর ভারসমতা রক্ষা করিতে বা আলো ও ছায়ার পাষাণ ভাঙিতে পারিয়াছেন। এই আলোছায়ার বৈপরীত্যকে chiaroscuro বলা হয়।

ছবির মধ্যে ঐক্য আনিতে ভারসাম্য ব্যতীত ভাব ও সাদৃশ্যের সহায়তাও প্রয়োজন। প্রত্যেক চিত্রেরই উদ্ভব হয় কোনো-একটি ভাব বা অনুভূতি হইতে যাহা শিল্পীর মনে প্রকাশের তাগিদ লইয়া আসে ও রূপসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত করে। এই প্রকাশ বা সৌন্দর্যরসের অনুভূতি না জাগিলে শিল্পসৃষ্টি নিরর্থক। যে ভাবটিকে চিত্রকর রূপ দিতে চাহিতেছেন, প্রেরণা গভীর ও উপলব্ধি-শক্তি বলিষ্ঠ হইলে একটি রেখাপাত মাত্রে চিত্রে তাহার অখণ্ড ঐক্য ও বিশিষ্টতা ফুটিয়া ওঠে। কবিতায়ও একটি-দুটি ছত্রে ভাবটি কী অপরূপ ভাবেই ফুটিয়া ওঠে; যেমন বৈশাখের বর্ণনায়—

দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী
পদ্মাসনে বস আসি রক্তনেত্র তুলিয়া ললাটে।

চীন-জাপানের চিত্রে স্বল্প রেখাপাতেই ভাব ফুটানোর সুন্দর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। চিত্রের মূল্য তাহার প্রকাশভঙ্গির লাবণ্য ও যথাযোগ্যতার উপর নিরূপিত হয়। চিত্রকরের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশভঙ্গির উপরই নির্ভর করে। ছবি যখন দেখি, আমরা ছবিটির অর্থ বা ভাবটিকেই জানিতে চাই। সেইজন্য ভাবপ্রকাশ সুন্দর ও যথার্থ হইলে ছবি সার্থক হয়।

ছবিতে ঐক্য আনিবার তৃতীয় ও বিশেষ উপায় সাদৃশ্য। সাদৃশ্যের দুই দিক— একটি বাহিরের, একটি ভিতরের। উভয়েরই প্রয়োজন আছে। ইউরোপীয় শিল্পীরা তাঁহাদের রচনায় বাস্তববাদিতার চূড়ান্ত সাধনা করিয়াছেন। তাঁহাদের চিত্রে ভারসমতা, কাঠামো-রীতি, আপেক্ষিক পরিমাণ, ঘনত্ব ও পরিপ্রেক্ষিত— সবই প্রকৃতির অনুকরণের চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এই

সাদৃশ্য আনয়ন বিশেষ পর্যবেক্ষণের ফল, এবং ভারতীয় শিল্পেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায় না তাহা নহে ; যেমন, কমল-নয়ন, সিংহকটি, গোমুখ-সদৃশ পৃষ্ঠদেশ, বান্ধুলী-ওষ্ঠ ইত্যাদি আমাদের দেশের শিল্পে মানবদেহের আদর্শ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিয়া ধরা হইয়াছে। তবে এগুলিকে ঠিক বাস্তবানুসরণ বলা যায় না, বরং এই উপমাগুলি দ্বারাই পূর্বদেশীয় শিল্পসৃষ্টিতে অপরূপ কল্পনাশক্তির পরিচয় পাই যাহা না থাকিলে শিল্পীর রূপসৃষ্টি ব্যর্থ। পূর্বে বলিয়াছি সাদৃশ্য দুইরকম— এক বাহিরের, অন্যটি ভিতরের ; একটি রূপের সহিত রূপের সাদৃশ্য, অন্যটি ভাবের সহিত রূপের সাদৃশ্য। বিচার করিলে দেখা যায়, এই সাদৃশ্য বস্তুঘেঁষা ও প্রকৃতির নিছক প্রতিলিপি হইলে শেষপর্যন্ত আমাদের মনকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না ; কারণ শিল্পীর মনের ছবিটি প্রধানত রেখার ছবি নহে, তাহা রসের ছবি ; তাহার মধ্যে এমন-একটি অনির্বচনীয়তা আছে যাহা সংসারের বস্তুতান্ত্রিক প্রত্যহের চোখ দিয়া আমরা প্রকৃতিতে সব সময় দেখি না। ছবি দেখিবার সময় কিন্তু অনুভূতির মনটি লইয়াই আসি এবং শিল্পীর অন্তরের সেই অমৃতরসের ভাবচ্ছবিকে তাঁহার রচনায় প্রধানত দৃশ্যমান দেখিলে তবেই তৃপ্ত হই। এই তৃপ্তি রসের সহিত রূপের সাদৃশ্য দেখিয়া— যাহা অন্তরের সহিত বাহিরকে মিলিত করে, যাহা অদৃশ্যকে দৃশ্যে প্রতিফলিত করে এবং এই রসের সহিত রূপের সাদৃশ্যই শিল্পীর সৃষ্টিকে সার্থক সুন্দর ও প্রাণবান করে।

এক সময় ইউরোপীয় শিল্পীরা প্রকৃতির হুবহু অনুকরণের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। সেই ঝোঁকের প্রতিক্রিয়া এখন বাস্তবকে অস্বীকার করিতে চাহিতেছে। ইহা ঠিক নহে, কারণ দুইয়েরই আবশ্যক আছে। সমস্ত বাস্তব অনুষঙ্গ বাদ দিলে মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে, তখন মনও স্বাভাবিক ভাবে চিন্তা করিতে পারে না। তবে শিল্পী কখনোই সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিবাদী হইতে পারেন না, কারণ মনের স্পর্শ দ্বারা রূপান্তরিত প্রকৃতির রূপকেই মানুষ প্রকাশ করিতে ও দেখিতে চায়। শিল্পী নিখিল-মানব-হৃদয়ের গোপন ভাবটিকে কোনো-এক মুহূর্তের প্রেরণায়

তাঁহার সাধনার ফল স্বরূপ প্রকৃতির রূপে উপলব্ধি করেন। এই উপলব্ধিকেই শিল্পী রূপ দেন এবং সাদৃশ্য এখানেই সার্থক হইয়া শিল্পরচনাকেই মানুষের মনে নিত্য-আসন দেয়।

এইবার বর্ণিকাভঙ্গ। সংগীতে যেমন সাতটি স্বর ও বহু শ্রুতি আছে সেইরূপ চিত্রশিল্পের ভাষাতেও সাতটি স্বরের অনুরূপ সাতটি মূল বর্ণ আছে, যথা— বেগুনি, তুঁতে, নীল, সবুজ, হরিৎ, কমলা ও লাল। এই সাতরঙের যে-কোনো দুটি রঙের মধ্যে আরো বিভিন্ন ওজনের রঙের রেশ বা বর্ণাভাস আছে। এইগুলির সাহায্যে শিল্পী তাঁহার বক্তব্য ছবিতে বলেন। ঐ সাতটি রংকে চিত্রভাষার স্বরবর্ণ বলা যায়। প্রকাশ করিবার একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে রঙের। বিভিন্ন রঙ বিভিন্ন বস্তুর প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং রঙগুলির ভাবপ্রকাশ ব্যতীত আরো গভীর অর্থ আছে যাহা দ্বারা আমাদের বিভিন্ন দেবদেবীর রূপে বর্ণভেদ কল্পনা করা হইয়াছে। কৃষ্ণ নীলবর্ণ, কারণ তাঁহাকে অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপ্ত অনাদি অনন্ত পরমপুরুষ বলিয়া জানি। জ্ঞান হ্রী ও ধী-র অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে শুভ্র কমলাসনে শুভ্রনিরঞ্জনমূর্তিতে কল্পনা করি। আমাদের জাতীয়-পতাকার তিনটি বর্ণই বিশেষ বিশেষ ভাব বা আদর্শের প্রতীক। রঙের একটি প্রভাবশক্তি আছে, যেমন, লাল রঙ উত্তেজক, ইহা শক্তি সৌভাগ্য ও অনুরাগের চিহ্ন; হরিৎ আনন্দের; এবং সবুজ নবীনতাপ্রকাশক ইত্যাদি। বিজ্ঞান বর্ণ সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে; তাহার মধ্যে একটি এই যে, মানুষ বস্তুর রূপ বুঝিবার বহু আগে বর্ণের শক্তি অনুভব করে। কবিতায় যেমন সুর, ছবিতে তেমনি রঙ আমাদের নূতন ভাবে ও রসে প্লাবিত করে। রেখাচিত্রে আমাদের বুদ্ধি আনন্দ পায়, রঙ কিন্তু আমাদের ভাবরাজ্যে গিয়া করাঘাত করে। সাতটি বর্ণের মধ্যে লাল হরিৎ ও নীল— এই তিনটিকে মূল বা শুদ্ধ বর্ণ বলে। বর্ণের সমারোহ শিল্পীর রেখাচিত্রের সর্বাঙ্গ ঐশ্বর্যভূষিত করে। চিত্র তখন এক নূতন ভাবেতে উজ্জীবিত হয়। সংগীতশাস্ত্রের বাদী-বিবাদীর সুরের মতো বিভিন্ন

বর্ণের মধ্যেও বাদী-বিবাদীর সম্পর্ক আছে ; এই বৈপরীত্যের যথোপযুক্ত ব্যবহারে চিত্রকর অভিনব ভাবের সৃষ্টি করেন। ইউরোপীয় শিল্পীরা বর্ণসংযোজনায় অদ্ভুত ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছেন। বর্ণের এই ঐকতান-রচনা করা চিত্রশিল্পের একটি দুরূহ কৌশল। রেখা জিনিসটি সুনির্দিষ্ট এবং বর্ণ নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্টের সেতু।

উপসংহারে এই কথাই বলা যায় যে, সকল প্রকৃত আর্টেই একটি বাহিরের ও একটি চিত্তের উপকরণ থাকা চাই— অর্থাৎ একটি রূপ, অপরটি ভাব। এই উপকরণকে সংযম দ্বারা বাঁধিয়া গড়িতে হয়, বাহিরের বাঁধন পরিমাণ, ভিতরের বাঁধন লাবণ্য। তার পর এই ভিতর ও বাহিরকে মিলাইতে হইবে সাদৃশ্যের জন্য। কিসের সঙ্গে সাদৃশ্য ? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'এই সাদৃশ্য হইবে ধ্যানরূপের সহিত কল্পরূপের।' তার পর এই সাদৃশ্যকে ব্যঞ্জনার রঙে রাঙাইতে পারিলে তবেই যথার্থ আনন্দরূপের প্রকাশ হইয়া শিল্পের সৌন্দর্যসৃষ্টি সার্থক হইবে।

ভাস্কর্য ও সংগীত

চিত্র-আলোচনার পর এইবার ভাস্কর্য ও সংগীত সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। ভাস্কর্য তিন মানের শিল্প— রেখা, নানা পরিসরের মুখ বা ক্ষেত্র, এবং আলো ও ছায়ার অবকাশ। সমতল ক্ষেত্রের বুকে নানা আকৃতির গহ্বর কাটিয়া নানা পরিসরের আলোকপাত করিয়া ভাস্কর তাঁহার কল্পিত মূর্তিকে ফুটাইয়া তুলেন। রেখা দ্বারা ভাস্কর তাঁহার কল্পিত রূপের সীমা, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা নির্ধারণ করেন। কাঠ বা পাথরের খণ্ড হইতে এইরূপে খোদাই করিয়া মূর্তির আদল বাহির করিতে শিল্পীর বহুদিন লাগে ; ততদিন তাঁহার মানস-প্রতিমাকে শিল্পী মনের মধ্যে জাগ্রত রাখেন— যেন বাহিরের অনাবশ্যক অংশ দ্বারা লুক্কায়িত প্রতিমাটির আবরণ শিল্পী ধীরে ধীরে মোচন করিতেছেন।

রেখাবর্ণের চিত্র অপেক্ষা ভাস্করের গঠিত মূর্তির মায়া অধিকতর বাস্তব,

কারণ ইহাতে আমরা সত্যবস্তুর অনুরূপ অনুভূতি লাভ করি। ভাস্করের রূপ-কল্পনার বিচার তাহার রেখাসমষ্টির ঐকতানের উপর এবং তাহার নানা পরিসরের ভারসংগতির উপর নির্ভর করে। চিত্র অপেক্ষা ভাস্কর্যে রেখার মূল্য আরো বেশি, কারণ বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ছন্দের আলোকপাতে মূর্তির উপর রেখার তারতম্য ঘটে। প্রাচীনকালে গ্রীসে ও রোমে মূর্তিতে বর্ণ-যোজনার রীতি ছিল। ভারতে মাটির দেবদেবীর প্রতিমায় এখনো বর্ণ সংযুক্ত হয়। বর্ণযোজনার প্রথা রহিত হইয়া মূর্তিশিল্প রেখা ও আলোক-পাতের দুইটি মাত্র সাধনে সীমবদ্ধ হইয়াছে। পাথরের উপর পরুষ ও মসৃণ ভাব ফুটাইয়া ভাস্কর মূর্তিশিল্পেও বিপরীত ও বিবাদী রসের ঘাত-প্রতিঘাতে অভিনব ভাব ফুটাইয়াছেন। ভারতে পহ্লবযুগের কয়েকটি খোদিত প্রস্তরফলকে ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। ভাস্কর্যেও ছন্দরচনা একটি অপরিহার্য উপাদান ও সাধন। রেখা রচনা ও সংস্থানের মধ্যে তাহার প্রকাশ। সাঁচীস্তূপে এই ছন্দলীলার নিপুণ উদাহরণ দেখা যায়।

ভাস্কর্যশিল্পে আর-একটি বিশিষ্ট রসপ্রকাশের সুযোগ আছে— ইহা স্থির রস বা শান্ত রস, ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত ভারতের ‘প্রজ্ঞাপারমিতা’। নিশ্চল পাষাণে গতির চঞ্চলতা ফুটানো স্থির রস ফুটানো অপেক্ষা কঠিন। ইহাঁর সুন্দর নিদর্শন মাইরনের ‘চক্র-নিক্ষেপকারী’ মূর্তিতে। এই গতিশীল মূর্তির বেগ-ধারণের সার্থক মুহূর্তটি নিপুণ কৌশলে ধরা হইয়াছে। গতি ও স্থিতি দুটি আপেক্ষিক বস্তু। গতির তুঙ্গ অবস্থায় ক্ষণিকের স্থিতি দেখা যায়, যেমন, সমুদ্রের ঢেউটি ভাঙিয়া গড়িবার পূর্বমুহূর্তে ক্ষণেক স্থির হইয়া দাঁড়ায়। ইহা নিশ্চলতা নহে, দুইটি শক্তির বিরোধের মধ্যে সাময়িক গতিহীনতা। এই গতির মধ্যে স্থিতির অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত ভারতীয় ভাস্করের অপূর্ব কল্পনা ‘নটরাজ’-মূর্তি।

পশ্চিমদেশে ভাস্কর্যের ধারণা আদর্শ মানবদেহ আশ্রয় করিয়া অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সকল শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভাস্কর্যেও

স্বাধীন কল্পনার অবকাশ আবশ্যক। এই অবাধ অপরূপ কল্পনা ভাস্কর্যে 'নরসিংহ' 'সেকমেটের' 'ধ্যানী' প্রভৃতি মূর্তিতে সৌন্দর্যের অভিনব ভাব প্রকাশ করিতেছে।

কানে শোনার পথে শব্দ ও সুরের ভাষায় পার্থক্য আছে। কথা বুদ্ধিগম্য সকল ভাবকে প্রকাশ করে, কিন্তু সুর অনির্বচনীয়ের সংবাদ আনিয়া অনুভূতির তন্ত্রীকে আকুল করে। সৌন্দর্যের সাধনায় বা ভাব-প্রকাশের সার্থকতায় সংগীতের স্থানই প্রধান, কারণ বাণীর সহিত সুর সংযুক্ত হইয়া গান অপূর্ব প্রাণৈশ্বর্যে মণ্ডিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে।' অর্থবিশ্লেষ করিয়া দেখিলে যে কথাটা যৎসামান্য, সংগীতের দ্বারা তাহা অসামান্য হইয়া ওঠে, কারণ কথার মধ্যে বেদনা সংগীতই সঞ্চার করিয়া দেয়। সুরের ও কথার ভিত্তিগত প্রভেদ এই যে, কথার বিশেষ প্রকাশ ভাবে। প্রতিভাশালী কবি কবিতার ছন্দে এবং রসাত্মক ভাবঘন শব্দের জাল পাতিয়া মানবহৃদয়ের অনেক সূক্ষ্ম ভাবানুভূতিকেই বন্দী করিতে পারেন, কিন্তু মানুষের অন্তরলোকের অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করিতে সক্ষম একমাত্র সুর। প্রচণ্ড শারীরিক ক্লেশের বেদনাবোধেও আমরা যে আর্তনাদ করি তাহাও শব্দের সহিত সুর সংযুক্ত করিয়া প্রকাশ হয়। কথার আবেদন ও সুরের নিবেদনের মধ্যে একটা দোটানার ভাব থাকিয়া যায়। হিন্দী ক্লাসিকাল গানে যেখানে কথাবস্তু অপেক্ষাকৃত কম, সুর সেখানে আপনাকে কতকটা স্বাধীন ভাবে বিস্তার করে।

সকল প্রকৃত আর্টে সৌন্দর্যসৃষ্টির যে রীতি, তাহাই সংগীত-শিল্প সম্বন্ধেও খাটে। চিত্রশিল্পের সাতটি বর্ণের ন্যায় সংগীতের সাতটি সুর ও একশো আঠাশটি শ্রুতি বা সুরাভাস একটি বিশেষ নিয়ম বা সংযমে বাঁধা পড়িয়া ভাব সৃষ্টি করে। তিনটি গ্রামে উদারা মুদারা ও তারায় সুরশ্রুতির আঘাত অনির্বচনীয় লোকের দুয়ার খুলিয়া দেয়। কাব্য ও চিত্রের মতো সুরেরও ব্যঞ্জনা ও অলংকার প্রভৃতি আছে। নানা বিচিত্র পর্দার পথে ঘুরিতে ঘুরিতে সকল সুর একটি সংগতিতে

লয় পায়। নানা সুর নানা ভাব-উদ্দীপক ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুরের সাধনার রীতি শিল্পশাস্ত্রে দেখা যায়।

মোটামুটিভাবে সংগীতের বিচার করিলে দেখা যায়, ইহার উপকরণ প্রধানত ধ্বনি মাত্র, যাহা অতি লঘু এবং সরাসরি বা অপরোক্ষভাবে ভাবপ্রকাশ করে। কাব্যে কথার ধ্বনিগুলি কাজে লাগে বটে, কিন্তু অর্থের মধ্য দিয়াও ভাবের প্রকাশ আবশ্যক, সুতরাং সেখানে ভাবপ্রকাশই পরোক্ষভাবে হয়। পক্ষান্তরে সংগীতে ইহা অপরোক্ষভাবে হয়। দার্শনিক শোপেনহাওয়ার বলেন, শিল্পের মধ্যে সংগীতের স্থান সর্বোচ্চ।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন

আমরা যে সৌন্দর্যদর্শন আলোচনা করিতেছি ইহা বর্তমান সময়ের সৌন্দর্যবিদ্‌গণের অভিমতের সমন্বয় মাত্র। এই দার্শনিকগণের অধিকাংশই ইউরোপীয়। তাঁহারা বলেন, প্রকাশই সৌন্দর্যসৃষ্টির মূলে। ইটালীয় দার্শনিক ক্রোচে এই কথা প্রথম জোর দিয়া বলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশকে শিল্পসৃষ্টির প্রথম সত্য বলিয়া মানিয়াছেন, কিন্তু উহাকেই শেষ বা একমাত্র সত্য বলিয়া মানিতে প্রস্তুত হন নাই। রবীন্দ্রনাথ বলেন, শুধু প্রকাশ হইলেই চলিবে না, কি এবং কতখানি প্রকাশ হইল তাহাও বিশেষ বিবেচ্য। তাঁহার মতে সাহিত্যে যে-কোনো ভাবকে ফুটাইয়া তুলিলেই রচনার সার্থকতা হয় না, রচনার বিষয় বা ভাবটিকেও সুনির্বাচিত হইতে হইবে— যাহা মানুষের যথাযথ পরিচয় দেখাইতে পারিবে। পেটুকতা মানুষের মধ্যে বিশেষ ও ব্যাপক ভাবে দেখা যায়, তাই বলিয়া কি ইহাকে সাহিত্যে প্রেমভক্তি, স্নেহদয়ার পঙ্‌ক্তিতে বসানো যায়? রবীন্দ্রনাথ বলেন, সাহিত্য সুন্দর করিতে হইলে ইন্দ্রিয়ের হীনতর বৃত্তি-

প্রবৃত্তিকে বর্জন করিয়া মানব-স্বভাবের উচ্চতর ধর্ম ও হৃদয়বৃত্তিগুলিকেই সৌন্দর্যসৃষ্টির সামগ্রী করিতে হইবে। মানুষের পেটুকতা একটি অতি বাস্তব সত্য। কিন্তু সাহিত্যে আমরা সত্যকে চাহিতেছি না, মানুষকে চাহিতেছি। নীচ ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি মানবধর্মে বা মানবেতিহাসে স্থায়ী কোনো আসন পায় নাই— সুতরাং সাহিত্য-দেহে তাহাদের স্থান দেওয়া মানে মানুষের মিথ্যা বর্ণনা দেওয়া।

সুতরাং দেখিতেছি, প্রকাশমাত্রকেই সৌন্দর্যের সৃষ্টি বলিয়া রবীন্দ্রনাথ মনে করেন নাই। তাঁহার মতে যথার্থ সৌন্দর্য তাহাই যাহাতে বিশুদ্ধ আনন্দ পাওয়া যায়, এবং সার্থক সাহিত্যে আমরা এই আনন্দই লাভ করি। যে-কোনো ভাব প্রকাশেই সাহিত্যের এই আনন্দরূপ আসে না, সুতরাং সৌন্দর্যসৃষ্টিতে মহৎ আনন্দ ফুটাইতে হইলে ভাবনির্বাচনেও সংযম আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথ আরো বলেন যে, সৌন্দর্যপ্রকাশও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নহে। মানুষের সহিত বহিঃপ্রকৃতির যে-ঐক্য তাহাকে প্রকাশ করিয়া মানব-অন্তরে যে অনন্ত অনির্বচনীয়তা আছে তাহার সন্ধানও শিল্পসৃষ্টিতে মিলাইতে হইবে। প্রকৃতির বহু খণ্ডখণ্ড রূপ আছে, তাহার সুষমা আমাদের সুখ দেয়; কিন্তু এই খণ্ডের সুষমায় খণ্ড সত্যই প্রকাশ পায়— সমগ্র সত্য পায় না। এই-সব খণ্ডবিভাগ যখন এক হইয়া সমগ্র ও বৃহৎ সত্যের আভাস আনিয়া দেয় তখন আমরা খণ্ড ইন্দ্রিয়ভোগের সুখ ভুলিয়া যাই এবং সত্তার আনন্দরূপকে উপলব্ধি করি। ইহার জন্য সাধনা প্রয়োজন, যাহা প্রথমে মন ও পরে একে একে বুদ্ধি হৃদয় ধর্মচেতনা এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সমস্ত আবরণ মোচন করিয়া আনন্দলোকের দুয়ার খুলিয়া দিবে। সুতরাং সৌন্দর্যকে মহৎ এবং যথার্থ আনন্দের রূপে উপলব্ধি করিতে হইলে মানুষকে তাহার উন্নত মানসিক বৃত্তির শক্তির সহায়তা লইতে হইবে।

এইভাবে দেখা যাইতেছে, রবীন্দ্রনাথের মতে সৌন্দর্যের উপভোগ অন্য কোনোও সুখের পর্যায়ে পড়ে না। ইহা দ্বারা সত্যানুভূতি হয় এবং সত্যানুভূতির

জন্য হৃদয়াবেগ অপেক্ষা সমাহিত বুদ্ধি এবং জাগ্রত চেতনার প্রয়োজন অধিক। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' গ্রন্থের "সৌন্দর্যবোধ" প্রবন্ধে বলিয়াছেন, 'যথার্থ সৌন্দর্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ, লোলুপ ভোগীর কাছে নহে।' রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের মধ্যে মঙ্গলকে দেখিতে চান। তিনি বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-রসিকদের মতো সৌন্দর্যোপলব্ধিকে একটি স্বতন্ত্র ক্রিয়া মনে করেন নাই। সৌন্দর্যচর্চা বলিয়া ইউরোপে যে একটি সাম্প্রদায়িক ধুয়া আছে, রবীন্দ্রনাথ তাহার বিরোধী ছিলেন। সত্য সুন্দর ও শিবকে তিনি এক করিয়া দেখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, 'সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ।' রবীন্দ্রনাথ আরো বলিয়াছেন, 'সত্যের যথার্থ উপলব্ধিমাত্রই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য।' আমরা দেখিয়াছি, সত্য সুন্দর ও মঙ্গলকে পরমার্থেরই তিনটি রূপ বলিয়া ধরা হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই পরমার্থকেই উপলব্ধি করিয়া, সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের সংজ্ঞাগুলির মধ্যে বিভেদ অপেক্ষা যোগকেই অধিকতর প্রকাশ হইতে দেখিয়াছেন। এই সত্য কিন্তু বৈজ্ঞানিকের জ্ঞাতব্য তথ্যের খণ্ড সত্য নহে, ইহা বৃহৎ সমগ্র সত্য, যাহা অন্তরাত্মাকে সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির সহিত যুক্ত করিলে উপলব্ধি করা যায়। মঙ্গলকেও তিনি কেবলমাত্র সমাজস্বার্থ বা ব্যক্তিস্বার্থের হিত-সাধন-মাত্র করিয়া দেখেন নাই। মঙ্গল ইহা অপেক্ষাও বড়ো বস্তু। সুন্দরকে মঙ্গলময় দেখিয়াছেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্যকে শিক্ষামূলক করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, এরূপ মনে করা ভুল। সৌন্দর্যকে তিনি প্রয়োজনের গণ্ডির ঊর্ধ্বে তুলিয়া দেখিয়াছেন এবং মঙ্গলকে তাহারও ঊর্ধ্বে আরো বৃহৎ রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। সমস্ত মঙ্গলের মধ্যকার গভীরতম ঐক্যের সহিত রবীন্দ্রনাথ মানবাত্মার নিগূঢ় যোগ দেখিয়াছেন এবং মঙ্গল ও সুন্দরের বিভেদ দেখেন নাই। সত্যের মধ্যেও তিনি ঐক্য দেখিয়াছেন ও সত্যকেও সুন্দর হইতে ভিন্ন মনে করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ একটি অতি উচ্চ দৃষ্টিশিখর হইতে মানব-সাধনার এই তিনটি

ক্ষেত্রের বিচার করিয়াছেন; কারণ তাঁহার সাধনা ও জ্ঞানের ক্ষেত্র অতি গভীর এবং ব্যাপ্ত, সাধারণের নিকটে উহা অনেক সময়ই দুরধিগম্য। রবীন্দ্রনাথের বিচারফলগুলির গভীরতা স্বতঃপ্রামাণিক এবং উহা আমাদের বুদ্ধিবিচারের সম্পূর্ণ আয়ত্তে না আসিলেও আমাদের অন্তরের স্বীকৃতি সহজেই পায়। দর্শনের সত্য অর্থে যদি তাহাকেই বুঝায়, যাহা প্রত্যক্ষানুভূতির ফল— শুধুমাত্র বুদ্ধি-বিচারদ্বারা প্রাপ্ত নহে, তাহা হইলে রবীন্দ্র-সৌন্দর্যদর্শনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হইবে। যে উপলব্ধি দিয়া রবীন্দ্রনাথ সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের ভেদ সম্বন্ধে সমস্যার সমাধান করিয়াছেন তাহার দ্বারাই আরো একটি বিশেষ প্রশ্নের উত্তরও দিয়াছেন। রচনায় কবির ব্যক্তিত্বের প্রভাব আছে কি নাই?— এই প্রশ্নের উত্তরে কবি কীট্‌স্ এবং আধুনিক কালে টি. এস. এলিয়ট যাহা বলেন তাহাই আমরা সাধারণ মত হিসাবে মানিয়া লইয়াছি। ঐ প্রশ্নের মীমাংসা তাঁহারা এইভাবে করিয়াছেন যে, কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রচনায় থাকে না। মানুষ হিসাবে কবির স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে; কিন্তু কবি হিসাবে তাঁহার এই স্বাতন্ত্র্য থাকে না। কবি রচনা করিবার সময়ে অবাধ কল্পনাশক্তি এবং গভীর সহানুভূতি দ্বারা বিশ্বজনীন ভাবগুলির সহিত এক হইয়া গিয়া তাহা ফুটাইয়া তুলেন। রচনা-ক্ষেত্রে রচয়িতার ব্যক্তিগত আন্তরিক অনুভূতি নাই, এবং তাহা থাকিবার প্রয়োজন নাই। রচয়িতা এখানে বহুরূপী। উৎকৃষ্ট রচনায় তাই ব্যক্তিবিশেষের সুসংগত মতামত বা ক্রমবাহী ভাবধারা প্রকাশ পায় না, যেমন শেক্সপীয়রের রচনায় দেখি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই অভিমতের বিরোধী। তিনি বলেন, রচয়িতা তাঁহার রচনার মধ্যেই আছেন। ব্যক্তি সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশ হন— কিন্তু সেই ব্যক্তিত্ব এত ব্যাপকভাবে থাকে যে তাহাকে আমাদের যুক্তির সংকীর্ণ ধারা দিয়া ধরিতে পারি না। কবি আপনার অন্তরকেই প্রসারিত করিয়া সকল ভাবনাকে আত্মসাৎ করিয়া একটি বৃহৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন। সুতরাং তাঁহার বিশেষত্ব অত্যন্ত বৃহৎ বিশেষত্ব। সুতরাং কবির রচনা তাঁহার নিজস্ব

অনুভূতির বাহিরে নহে; কারণ তিনি অন্তরকেই বিস্তৃত করিয়া অনুভূতিকে বৃহৎভাবে উপলব্ধি করেন।

এই ব্যক্তিত্ব যত ব্যাপক হইবে সাহিত্যে তাহার প্রকাশ হইলে সেই রচনাও তত বড়ো হইবে। বৃহৎ সাহিত্যে বৃহৎ ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যদর্শন সম্বন্ধে এইখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের শেষোক্ত মতটি আমাদের বুঝিতে হইবে এবং তাহা হইলে সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও নৈর্ব্যক্তিকতা লইয়া যে দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে তাহার মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা আছে।

অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী'তে[1] শিল্প ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁহার মতামত অতি সরল ও মনোরম ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি দর্শনকে দর্শনই রাখিয়াছেন— কেবল যুক্তিতর্ক দিয়া বুঝিতে বা বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-আলোচনা ভাবগাম্ভীর্যে এবং সত্যনিরূপণে দর্শনশাস্ত্রের পঙ্‌ক্তিতে পড়িলেও রচনাভঙ্গি এবং প্রকাশগুণে উহা রস-সাহিত্যের উজ্জ্বল মণি। যাঁহারা সৌন্দর্যদর্শনের খাসমহলে প্রবেশ করিতে চান তাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থ সদর-দরজার মতো। জ্ঞানের সহিত সাহিত্যরসের এমন উদার পরিবেশন বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে অল্পই দেখা যায়, এবং ইংরেজি সাহিত্যেও প্রায় বিরল। আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে এই গ্রন্থের দুটি-একটি কথা আলোচনা করিবার আছে।

প্রথমত দেখিতে পাই, অবনীন্দ্রনাথ প্রকাশেই সৌন্দর্যের রহস্য দেখিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, 'ভাষার তপস্যায় বলীয়ান্ মানুষ পাথরের কারাগার থেকে

১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৪১

বার ক'রে নিয়ে এলো যে ভাষাকে, চিরসুধাময়ী রসের নির্ঝরিণী তারই চতুঃষষ্টি ধারা হ'ল— কথা, ছবি, মূর্তি, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি কলাবিদ্যা' (পৃ. ৮১)। ভাবপ্রকাশেই রসের সৃষ্টি ও রূপের অনুভূতি জাগে এবং সেই ভাবই নানা ভঙ্গিতে ধরা পড়ে— 'রচনার ভঙ্গিতে কথার ভঙ্গিতে সুরের ভঙ্গিতে ওঠা-বসা চলা-ফেরার ভঙ্গিতে ধরা পড়লো ভাব, তবেই তো পেলেম মনের সঙ্গে মিলিয়ে বস্তুটির আসল রসটা' (পৃ. ৩৬৩)। বস্তু যে ভাবটিকে জাগায় তাহাকেই গ্রহণ করিয়া শিল্পীকে অপরের কাছে ধরিয়া দিতে হয়— 'প্রথম আপন ক'রে নেওয়া ভাব ক'রে, তার পর সেটিকে সকলের আপন ক'রে দেওয়া ভাবযুক্ত ক'রে— এই হ'ল কৌশল আর্টিস্টের' (পৃ. ৩৭০)।

দ্বিতীয়ত দেখা যায়, ভাব-বিনিময়ের সমস্যাটির অবনীন্দ্রনাথ অতি সহজে সমাধান করিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেন যে, বস্তুর মধ্যে যে ভাব নিহিত আছে তাহা শিল্পী তাহার শিল্পদৃষ্টি দিয়া ধরিতে পারেন এবং সেই ভাবগুলিকে আপনার ভাবে মিলাইয়া আন্তরিক অনুভূতি দিয়াই প্রকাশ করেন। যেহেতু সে ভাবগুলি শিল্পীর নিজস্ব কোনো দুর্বলতা বা মায়ার দ্বারা সৃষ্ট নহে তাহা সর্বজনীন, সেইজন্য সবার কাছেই তাহাদের আবেদন আছে, 'ভাবের জিনিস সে মায়ার অতীত জিনিস, কেননা সত্যভাবে তাকে লাভ করি আমরা এবং সেই কারণেই সত্য হ'য়ে ওঠে সে অন্যের কাছেও' (পৃ. ৩৭১)।

তৃতীয়ত, কোনো বস্তুর যথার্থ সৌন্দর্যের রূপটি দেখা বা বস্তুটিকে শিল্পদৃষ্টিতে দেখা চোখের মায়া নহে বরং উহাই বস্তুটির বৃহত্তর সত্য জানিবার উপায়। সত্য ও সুন্দরে মূলগত কোনো ভেদ নাই। সাধারণ দৃষ্টি দিয়া যা দেখি তাহা দ্রষ্টব্য বস্তুর সবটুকু সত্য দেখায় না। সত্যের যথার্থ উপলব্ধির জন্য অন্তর্দৃষ্টি ও দিব্যদৃষ্টি চাই এবং শিল্পী তাহা দিয়াই রসের সৃষ্টি করেন। যে ভাব-সত্যটি কোনো বস্তুকে আশ্রয় করিয়া গোপন থাকে, শিল্পীর দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়ে এবং তাঁহার রচনায় প্রকাশ পায়।

চতুর্থত, শিল্পবস্তু কোনো প্রকৃত বস্তুর অনুকরণ নহে, ইহা স্বাধীন সৃষ্টি— 'সোনা আর মিনাকারি দিয়ে এমন অভ্রান্ত আকৃতি দিলে স্বর্ণকার সোনার প্রজাপতিকে যে ভুল হ'ল আসল ব'লে; এটা খুব কৌশলের পরিচয় দিলে, কিন্তু শিল্পীর শিল্পজ্ঞানের খুব বড় পরিচয় দিলে না এ ভাবের সদৃশ করণ' (পৃ. ৩৯১)। এই ধরনের ভ্রান্তি জাগানো নিম্নস্তরের শিল্পেই দেখা যায়। উচ্চশিল্পে যে সাদৃশ্য দেখাবার চেষ্টা করা হয় তাহা বস্তুমূলক বা ঘটনামূলক নহে তাহা কল্পনামূলক ও ভাবমূলক সাদৃশ্য। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ধ্যানরূপের সহিত কল্পরূপের সাদৃশ্য'। অর্থাৎ কোনো বস্তুকে আশ্রয় করিয়া যে কল্পনারাজ্য লোকচক্ষুর অন্তরালে মেলা রহিয়াছে এবং যে ভাবগুলি তাহাতে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে তাহাই শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি ও দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়ে এবং শিল্পীর সৃষ্টিতে প্রকাশ পায়। বড়ো শিল্পী কোনো বস্তুর বহিরাকৃতিকে হুবহু অনুসরণ করেন না, বরং সেই বস্তুর বিশেষ ভাবটিকেই ফুটাইতে চান। অবনীন্দ্রনাথ বলেন, 'এ-ক্ষেত্রে রূপ ও কল্পনা দুইই ভাব-ব্যঞ্জনার কাজে লাগলো, এবং ভাব ও রসই এখানে প্রাধান্য পেলে দৃষ্ট এবং কল্পিত দুয়ের উপরে' (পৃ. ৩৯৩)।

পঞ্চমত, শিল্পসৃষ্টি বহিঃপ্রকৃতির অনুকরণ নহে, ইহা শিল্পীর স্বকীয় সৃষ্টি; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা অনাসৃষ্টি বা সৃষ্টিছাড়া খাপছাড়া একটা কিছু নহে এবং ইহার আবেদন সকলের কাছেই আছে। ভাবুক-দৃষ্টি সাধারণ কার্যকরী দৃষ্টি নহে, কিন্তু উল্‌টাপাল্‌টা করিয়া দেখিলেই যে ভাবুকের মতো দেখা হইল এবং সৌন্দর্যরস আসিল তাহা মনে করা ভুল। শিল্পী কল্পনাকুশলী ও ভাবুক, কিন্তু তবু তাঁহার কল্পনা ও ভাব মূলে বাস্তবকে আশ্রয় করিয়া। 'সত্যপীরের মাটির ঘোড়া, কালীঘাটের পট, নতুন বাংলার আমাদের ছবি, পুরানো বাংলার দশভুজা— এর একটাও নিছক কাল্পনিক জিনিস নয়। এরা সবই বাস্তবকে ধ'রে তবে তো প্রকাশ হ'ল? মন যে বাস্তবকে স্পর্শ করেই আছে, নানা বস্তুর নানা ভাবের স্মৃতি জমা হচ্ছে মনে। নিছক কল্পনা— সে মনেই উঠতো মনেই থাকতো, যদি-না

বাস্তবজগতের ভাব ও রূপের সংস্পর্শে সে আসতো' (পৃ. ১৩০-৩১)। শিল্পী বাস্তব ও কল্পনার সন্ধি করেন— 'বাস্তবকে কল্পনা থেকে কতখানি সরালে কিম্বা কল্পনাকে বাস্তব থেকে কতটা হঠিয়ে নিলে art হয় এ তর্কের মীমাংসা হওয়া শক্ত, কিন্তু কল্পনার সঙ্গে বাস্তব, চোখে-দেখা জগতের সঙ্গে মনে-ভাবা জগতের মিলন না হ'লে যে art হবার জো নেই এটা দেখাই যাচ্ছে' (পৃ. ১৩২)। অপর স্থলে বলা হইয়াছে যে, এই ভাব-সত্য সত্যেরই এক রূপ এবং সকলের গ্রহণীয়, কারণ ইহা শিল্পীর ব্যক্তিগত ভাব বা কোনো-একটি অলীক মায়া নহে— 'মায়া দিয়ে একটা বস্তু যুক্ত হতে পারে কেবল আমারই সঙ্গে, কিন্তু অন্যের সঙ্গে তার মিলন ঘটে না' (পৃ. ৩৭১)। ভাবের বস্তু মায়ার অতীত এবং সে সত্যেরই রূপ। তাই তাহার আবেদন সর্বজনীন।

ষষ্ঠত, অবনীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যানুভূতিকে সাধারণ সুখ, কার্যকরী বুদ্ধি এবং বিচারবুদ্ধি হইতে পৃথক রাখিয়াছেন। ইহার প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য, কারণ সুন্দরের আনন্দকে প্রায়ই আমরা ভোগবিলাসের সুখের সহিত মিশাইয়া ফেলি। অবনীন্দ্রনাথ এখানে যে নির্দেশ দিয়াছেন— রবীন্দ্রনাথও "সৌন্দর্যবোধ" প্রবন্ধে তাহাই বলিয়াছিলেন। শিল্পীগুরু এস্থলে বলিতেছেন, 'বেতাল পঁচিশের ভোজন-বিলাসী শয্যাবিলাসী এরা সাতপুরুষ গদির তলায় একগাছি চুল, রাজভোগ-চালে শবগন্ধ অতি সহজেই ধরতে পারতো, কিন্তু বিলাসীর দেখা প্রকাণ্ডরকম স্বার্থ নিয়ে দেখা, অত্যধিক মাত্রায় কাজের দেখা, এ দৃষ্টি ভাবুকের দৃষ্টি কিম্বা কাজ-ভোলা শিশুর সরল দৃষ্টি একেবারেই নয়, অতিমাত্রায় বস্তুগত দৃষ্টিই এটা' (পৃ. ৩৮)। বিলাসী বৃহৎসত্য ও সুন্দরকে পায় না— 'বিলাসীর দৃষ্টি স্বার্থের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থেকে সৃষ্টির যথার্থ শোভা সৌন্দর্য ও রসের বিষয়ে মানুষটাকে বাস্তবিকই অন্ধ ক'রে রাখে অনেকখানি, আর ভাবুকের দৃষ্টি কাজ-ভোলা ছেলেবেলার দৃষ্টি— সৃষ্টির অপরূপ রহস্যের খুব গভীর দিকটায় নিয়ে চলে মানুষকে' (পৃ. ৪০)। বিলাসীর দৃষ্টি যেমন সত্য ও সুন্দরকে আবৃত করে

কার্যকরী দৃষ্টিও তাই করে— 'কাজের দৃষ্টি মানুষের স্বার্থের সঙ্গে দৃষ্টির জিনিসকে জড়িয়ে দেখে, আর ভাবুকের দৃষ্টি অনেকটা নিঃস্বার্থ ভাবে সৃষ্টির সামগ্রী স্পর্শ করে' (পৃ. ৪৫)। শিল্পী কোনো বস্তুকে তাঁহার 'প্রয়োজন-সিদ্ধির উপকরণ হিসাবে দেখেন না, বস্তুটির যথার্থরূপে দেখিতে চান; সেটিকে তাই আপনা হতে দূরে রাখিয়াই ভাব দ্বারা তাহার সহিত শিল্পী যুক্ত হইতে চান। এই শিল্পদৃষ্টি কিন্তু বৈজ্ঞানিকের সন্ধানী দৃষ্টি নহে। এই দৃষ্টি দ্বারা যে সত্যকে পাওয়া যায় তাহা অনুভবের সত্য, নিছক জ্ঞানের নহে— 'বহির্বাটীর রাস্তাঘাট নিয়ম-কানুন সমস্তই যেমন অন্দরমহলের সঙ্গে স্বতন্ত্র তেমনি বুদ্ধির প্রেরণা আর রসবত্তা বিকাশের পথ সম্পূর্ণ আলাদা' (পৃ. ৩৪)। পশ্চিমের দার্শনিকেরাও বিচারবুদ্ধিকে শিল্পসৃষ্টি বা সৌন্দর্যবোধের অবলম্বন মনে করেন না— বোধিকে (Intuition বা Imagination) প্রাধান্য দেন। বুদ্ধি বস্তুকে তাহার কার্য-কারণ সম্বন্ধে অন্য বস্তুসকলের সহিত জড়িত করে এবং একটি বৃহৎ বস্তুসমষ্টির ক্ষুদ্র এক অংশ রূপেই তাহাকে দেখে। বোধি কিন্তু বস্তুটিকেই স্বতন্ত্র ও বৃহৎ করিয়া দেখে এবং তাহার মধ্যেই সত্যের আভাস দেখে। এইজন্যই শিল্পীর চোখে বস্তুটি সুন্দর ও ভাবময় হইয়া প্রকাশ পায়।

সপ্তমত, আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে সৌন্দর্যের বিষয়বস্তুর সহিত তাহার আশ্রয়ের অচ্ছেদ্য যোগ আছে— তাহাদের ভিন্ন করিয়া দেখা ভুল। অবনীন্দ্রনাথ এই কথাটি বিশেষভাবে বলিয়াছেন। শিল্পকৌশলকে তিনি শিল্পের বহিরঙ্গ মনে করেন না এবং শিল্পবস্তুকে আশ্রয় বা আধার হইতে পৃথক করিয়া শিল্পের শবব্যবচ্ছেদ করার তিনি বিরোধী। অবনীন্দ্রনাথ বলেন, 'সুন্দর জিনিসের বাইরের উপকরণে আর ভিতরের পদার্থে হরিহর আত্মা— যেমন রূপ তেমনি ভাব। বহিরঙ্গ যা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গের অবিচ্ছেদ্য মিলন ঘটিয়ে সুন্দর বর্তমান হ'ল (পৃ. ২১০)। সুতরাং এইভাবে দেখা যায়, ভাব ও তাহার ভাষা উভয়ের সুষ্ঠু সমন্বয়েই সার্থক শিল্পসৃষ্টি হয় এবং সৌন্দর্যের প্রকাশ হয়।

সৌন্দর্যদর্শন

"বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী"তে আরো অনেক সমস্যার সুন্দর সমাধান রহিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে সে-সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইল তাহা হইতেই বোঝা যায়—সৌন্দর্যদর্শনের রূপ ও বিষয় কিপ্রকার এবং ইহাতে কতরকম সমস্যা আসিতে পারে। সমস্যার শুধুমাত্র শুষ্ক তর্ক দ্বারা সমালোচনা হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে ভালো ভাবে বুঝিতে হইলে আমাদের এমন-কোনো ব্যক্তির সাহায্য প্রয়োজন যিনি নিজে একাধারে শিল্পী ও দার্শনিক। আমাদের দেশে এমন লোক বিরল। শিল্পীগণ বেশির ভাগ রচনাকার্যে মগ্ন থাকেন এবং শিল্প সম্বন্ধে কোনো কঠিন চিন্তা বা চর্চা করিবার অবকাশ পান না। পক্ষান্তরে দার্শনিকগণ কেবল অধ্যয়ন ও চিন্তায় ব্যাপৃত থাকেন, তুলি বা লেখনী ধরিবার অবসর তাঁহাদের থাকে না। অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা দুইয়েরই সমন্বয় দেখি, সুতরাং তাঁহার কাছে শিল্পী ও সৌন্দর্যের সম্পূর্ণ সংজ্ঞা লাভ করিতে পারি। স্বর্গগত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই আশাতেই তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাগেশ্বরী'-অধ্যাপক পদে বরণ করেন। আশুতোষের আশা পূর্ণ হইয়াছিল। শিল্পী তাঁহার তুলি রাখিয়া কলম ধরিলেন এবং শিল্প ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁহার অনুভূতিরাশি অক্ষরের রূপে নামিয়ে আসিয়া অপূর্ব রসের সৃষ্টি করিল। দর্শন প্রকাশগুণে সাহিত্যের আসন অলংকৃত করিয়াছে। এইরকম রচনার নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী ব্যতীত আমাদের দেশে আর নাই। সৌন্দর্যদর্শন সম্বন্ধে বিদেশীয় কয়েকটি গ্রন্থ সাহিত্যের ভাষায় রচিত হইয়াছে। প্লেটো, হেগেল ও রাস্কিনকে তন্মধ্যে প্রধান রচয়িতা বলা যায়। কিন্তু ইহারা কেহই শিল্পী নহেন, তাঁহাদের হাতেকলমে কোনো শিল্পের সহিত যোগ ছিল না, শুধু প্রতিভা এবং কল্পনাশক্তির জোরে তাঁহারা লিখিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং শিল্পজগতের পথ-প্রদর্শক এবং সৌন্দর্যতত্ত্বের চিন্তাগুরু।

—

